DACCA: PRINTED AT THE BHARAT-MAHILA
PRESS BY DEBENDRANATH DUTTA.

পরম [illegible]
সুনীতি দেবীকে এই পুস্তক শ্রদ্ধা ভক্তির সহিত অর্পিত হইল —
স্নেহের সরলা
৩১.৩.১

"মা, তুমি আমার বড় ভাল মা, এমন মা কে পায়, আমার যা কিছু ভাল, সব তোমার কাছ থেকে পেয়েছি।"

কেশব।

* * * *

"ত্থাখ্ মা, তোর নাড়িভুঁড়ি নিয়ে পৃথিবীর লোক এর পরে নাচ্‌বে। তোর ঐ ভাণ্ড থেকে এই ছেলে বেরিয়েছে।"

রামকৃষ্ণ পরমহংস।

* * * *

"When Keshab finds the recognition of his greatness by a grateful posterity the claims and virtues of his good noble-hearted mother will not go unrecognised."

PRATAPCHANDRA MAZUMDER.

বিজ্ঞাপন।

সাধক প্রচারক শ্রদ্ধেয় ভাই প্রিয়নাথ মল্লিক মহাশয় দেবী সারদাসুন্দরী সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তাহা ভূমিকারূপে দেওয়া গেল। মল্লিক মহাশয় শেষকালে সারদাসুন্দরীর একরূপ নিত্য সেবক ছিলেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। যোঃ।

ভূমিকা।

"আমার মা বড্ড ভালরে বড্ড ভাল।" তাঁর পরম মাতা সম্বন্ধেই শ্রীব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র এই উক্তি করেন; কিন্তু তাঁর গর্ভধারিণী মা সারদা দেবী সম্বন্ধেও এই উক্তি প্রয়োগ করিলে যে বিশেষ অতিরঞ্জিত হয় ইহা আমরা বলিতে পারি না। বাস্তবিক মা সারদা দেবীও কেশবের "বড্ড ভাল মা" ছিলেন। কোন মাকে "বড্ড ভাল মা" বলিলে যাহা বুঝায়, মা সারদা দেবী যথার্থ সেইরূপই ছিলেন। অন্ততঃ শ্রীব্রহ্মানন্দের সেই স্বর্গস্থ "বড্ড ভাল মা"র প্রতিমা স্বরূপ যে মা সারদা ছিলেন ইহা নির্ব্বন্ধাতিশয় চিত্তে বলা যাইতে পারে। আবার শ্রীকেশবচন্দ্রের মত ভাল ছেলের মা যিনি তিনি যে বড়ই ভাল মা তাহা কি আর প্রমাণ করিতে হয়?

শ্রীব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র যে বর্ত্তমান যুগের অসাধারণ মানুষ, ইহা সর্ব্ববাদী সম্মত। তিনি অবশ্যই জীবন্ত-ব্রহ্ম-প্রেরিত এবং তাঁহার যাহা কিছু মহত্ত্ব ও দেবত্ব তাহা সকলই সেই পরম মাতার প্রদত্ত। কিন্তু তাঁহার এই মহৎ ও দেব-ভাব অন্ততঃ মানবীয় দিকেও যে তাঁহার গর্ভধারিণী মাতা সারদা দেবী হইতে সঞ্চালিত

ইহা যাঁহারা তাঁহাদের উভয়কে দেখিয়াছেন তাঁহারা কিছুতেই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। শ্রীকেশবের ধর্ম্মপ্রাণতা হৃদয়ের প্রসারতা যেমন, তেমনই কেশবের অঙ্গ সৌষ্টব, হাত পায়ের গঠন, অঙ্গুলী এবং নখটী পর্য্যন্ত যে মা সারদার মতই ছিল। স্বয়ং আচার্য্য ব্রহ্মানন্দও একথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন যে তাঁহার "যাহা কিছু সকলই" তাঁহার এই মায়ের গুণে।

শ্রীকেশবচন্দ্রের দেহত্যাগের পূর্ব্বে মা সারদা যখন কেশবের পীড়ার অসহ্য কাতর যন্ত্রণা দেখিয়া বলিলেন—"বাবা কেশব, আমার পাপের জন্যই কি তুমি এত কষ্ট পাচ্ছো? তোমার মা'ত বড় ভালো, তিনিও তোমার কথা শুনেন, তাঁকে নয় বলনা তোমার এ যন্ত্রণা দুর করে দেন।" কেশব ইহার উত্তরে বলিলেন — "না মা, আমার যা কিছু সব যে তোমারই গুণে। আমি যার কোটী ধনের অধিকারী, আমি কি মাকে সামান্য পুঁই শাক ভিক্ষা চাব? ছি মা, আমার কষ্ট কি? আমার ভাল মা আমায় এ কোল থেকে ও কোলে নিয়ে আদর করে তুলছেন ফেলছেন। তাইতে আমি একটু হাঁপিয়ে পড়ছি এই যা—।"

ব্রহ্মানন্দের আপন মাতৃদেবী সম্বন্ধে যে এই উক্তি যে তাঁর—যা কিছু তাঁর মায়েরই গুণে, ইহা কেবল

ভাবোচ্ছ্বাস বা কথার কথা নয়। সত্যসন্ধ ব্রহ্মানন্দের এই উক্তি অকাট্য সত্য। কোন পশ্চাত্য পণ্ডিত বলিয়া ছিলেন, ভাল মা না হইলে ভাল ছেলে হয় না— তাহা সত্যই কেশব-জীবনে প্রমাণিত হইয়াছে বলা যাইতে পারে। সত্যই এমন ভাল মা বলিয়াই তিনি এমন ভাল ছেলে হইয়াছিলেন; আবার কেশবের ন্যায় ছেলের মাও যে অসামান্যা মা ছিলেন, আমরা তাহা কি অস্বীকার করিতে পারি?

মা সারদা দেবী পরম নিষ্ঠাবতী, প্রকৃত জীবন্ত বিশ্বাস সম্পন্না, পরম ধর্ম্মপ্রাণা হিন্দুমহিলা ছিলেন। যথার্থ ধর্ম্ম বিশ্বাসী যিনি, উচ্চ ধর্ম্মভাবে যাঁহার প্রকৃতি গঠিত ও সমুজ্জ্বলিত, তাঁহার নিকট যে কোন সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মাবলম্বীই হউন না কেন সকলেই আদৃত; নিষ্ঠাবতী হিন্দুবিধবা হইলেও মা সারদা দেবীর নিকট সর্ব্বপ্রকার ধর্ম্মভাবেরই চিরদিন আদর ছিল। কি হিন্দু, কি মুসলমান, কি ব্রাহ্ম, কি খৃষ্টান সকলকার প্রতি তাঁহার সমান স্নেহ, সমান যত্ন দৃষ্ট হইত। বিশেষতঃ যথার্থ ধার্ম্মিক দেখিলে তিনি সর্ব্বান্তকঃরণে ভালবাসিতেন ও যথেষ্টই সম্মান এবং আদর করিতেন। তিনি কাহাকেই কখনও অনাদর বা ঘৃণা করিতে জানিতেন না।

পূর্ব্বে শাক্ত বৈষ্ণবের পরস্পর বড়ই দ্বেষা দ্বেষী ছিল। মা সারদার পিতৃকুল শাক্ত, শ্বশ্রুকুল বৈষ্ণব, তাঁহার

জীবনে এই দুই ভাবের সমন্বয় আশ্চর্য্যরূপে ভগবান সম্পাদন করেন। শ্রীব্রহ্মানন্দের ধর্ম্মোদারতা এবং ধর্ম্মসমন্বয়ের ভাব যদিও স্বয়ং পবিত্রাত্মা প্রেরিত, কিন্তু তাহার কতকটাও যে মা সারদার জীবন-নিহিত এই বীজ হইতে অঙ্কুরিত নয়, কে বলিতে পারে?

আমরা মা সারদাকে তাঁর বৃদ্ধাবস্থাতেই দেখিয়াছি, তিনি যদিও হিন্দুধর্ম্মে নিষ্ঠাবতী, হিন্দু আচার সম্পন্না ছিলেন, কিন্তু ব্রহ্মানন্দের মা'তে তাঁর অটল এবং পূর্ণ সরল বিশ্বাস ছিল। তিনি বরাবর ব্রহ্মানন্দের উপাসনায় যোগ দিতেন। সময়ে সময়ে ব্রহ্মানন্দের সঙ্গেও তীর্থ-যাত্রায় যাইতেন। কেশবচন্দ্রের তিরোধানের পর নব দেবালয়ে উপাসনা কালে তিনি যে সমুদয় হৃদয়গ্রাহী প্রার্থনা করিতেন, তাহা যদি সে সময়ে কেহ লিখিয়া রাখিতেন, আমরা বিশ্বাস করি, শ্রীব্রহ্মানন্দের প্রার্থনার ন্যায় তাঁহার প্রার্থনাও, নববিধান বিশ্বাসীদিগের প্রার্থনা সাধন বিষয়ে যথেষ্টই সহায় হইত। বাস্তবিক তাঁর প্রার্থনা মুখের প্রার্থনা ছিল না। সম্পূর্ণ সরল এবং হৃদয়গ্রাহী ভাবে তিনি প্রার্থনা করিতেন। আমরা অনেক সময় তাঁহার প্রার্থনায় যোগ দিয়া অশ্রুবিসর্জ্জন না করিয়া থাকিতে পারি নাই।

শ্রীকেশবের পরম মাতার প্রতি বিশ্বাস সম্বন্ধে মা সারদা এ সেবককে একবার বলেন—"আমার সংসা-

রের সুখ ঐশ্বর্য্য যথেষ্ট ছিল, অনেক টাকা কড়ি গহনা ছিল, সোনার চাঁদ জগতখ্যাত সব ছেলেমেয়ে ছিল, সবই একে একে গিয়াছে। শোকে, দুঃখে, জরায়, বার্দ্ধক্যে আমি জর্জ্জরিত। কিন্তু প্রিয়, জান কি, কি করে আমি বেঁচে আছি? আমার কেশব আমাকে বলে গেলেন, 'আমার মাকে ডেকো. সব দুঃখ যাবে।' আমি তাঁরই সেই কথা শুনে, সেই মাকে ডেকে, সেই মা'র মুখ দেখেই বেঁচে আছি। আর সকলই সইতে পাচ্ছি।" কেশবের মা, সত্যই "বড্ড ভাল মা"। শ্রী:কেশবচন্দ্র যে বলিয়াছিলেন্ "আমার মা বড্ড ভালরে বড্ড ভাল, আমার মাকে তোরা চিন্‌লিনে", বাস্তবিক কেশবের এই "বড্ড ভাল মার" এবং কেশবের ধর্ম্মের প্রকৃত সাক্ষ্য. মা সারদার মত এমন করিয়া আর কে দিতে পারেন? এমন স্বর্গীয় সন্তানবাৎসল্য ও ধর্ম্মপ্রাণ-সন্তানে বিশ্বস্ততাই বা কোন্ মার?

শ্রীব্রহ্মানন্দের বাল্যজীবনী মা সারদা এ লেখকের নিকট বর্ণনা করিয়াছিলেন, "ব্রহ্মানন্দ" পত্রে আমি তাহা প্রকাশ করি, তাহাতেও মা'র ভক্ত-সন্তান-বাৎসল্যের বিশেষ পরিচয় আছে। ভক্ত-মাতা শচীদেবী বা ঈশা-মাতা মেরীদেবীর কথা পুস্তকে পড়িয়াছি, কিন্তু ব্রহ্মানন্দ-মাতা সারদাদেবী যে তাঁহা-

দেরই অনুরূপ ইহা প্রত্যক্ষ করিয়া জীবনে ধন্য হইয়াছি।

মা সারদাদেবী স্বর্গারোহণের কিছুদিন পূর্ব্বে এ অধম সেবককে বলেন—"প্রিয়, তোমার শরীর তত সবল নয়, বেশী ঘুরাঘুরী ক'রোনা, তুমি যে ধর্ম্ম পেয়েছ ইহাই ঠিক, এই ধর্ম্ম ধরে পড়ে থাকো, তোমার মনোরথ পূর্ণ হবে, ভক্তের সাধ মিটবে। তোমার খুব ভক্তি হবে।" সত্যই কেশবজননীর এই আশীর্ব্বাদ স্বয়ং পরম মাতার আশীর্ব্বাদ বিশ্বাস করিয়া ধরিয়া পড়িয়া আছি। ব্রহ্মানন্দের ধর্ম্মের প্রতি মা সারদাদেবীর কিরূপ আস্থা এবং বিশ্বাস, এই আশীর্ব্বাদও তাহার একটী পরিচয়।

শ্রীব্রহ্মানন্দের ধর্ম্মে মা সারদার বিশ্বাস যে কেবল মৌখিক বা বাহ্যিক তাহা নহে। তিনি অবশ্যই চির সংস্কার বশতঃ বাহ্যতঃ হিন্দু আচরণ সম্পন্না ছিলেন, কিন্তু ব্রহ্মানন্দের ধর্ম্মে যে তিনি পূর্ণ বিশ্বাসিনী এবং প্রকৃত আস্থা সম্পন্না ছিলেন, তাহার নিদর্শন স্বরূপ একটী আখ্যায়িকা উল্লেখ করিলেই সকলকার প্রতীতি হইবে।

একদিন সম্রাট সপ্তম এড্ওয়ার্ডের জন্মদিন উপলক্ষে মা সারদাদেবীকে দর্শন করিতে যাই, গিয়া শুনিলাম দেবী তেতলায় তাঁহার পূজার ঘরে পূজা করিতেছেন,

আমি আস্তে আস্তে সেখানে গিয়া দরজার বাহিরে সিঁড়ির নীচে তাঁহার অলক্ষিত ভাবে বসিলাম। মা সারদা তখন প্রার্থনা করিতেছিলেন। মা সারদা যদিও একাকিনী পূজা করিতেছিলেন, তিনি কথা কহিয়া প্রার্থনা করিতেছিলেন। শুনিলাম এইভাবে প্রার্থনার শেষাংশ তিনি সমাপন করিলেনঃ—"মা, আজ রাজার জন্মদিন, রাজা তোমারি সন্তান, তুমি তাঁকে রাজমুকুট দিয়াছ, তুমিই তাঁকে এতবড় রাজ্যের শাসন পালনের ভার দিয়াছ, তাঁকে তুমি আশীর্ব্বাদ ক'র যেন, তাঁহার এই বিশাল রাজ্যের শাসন পালন তিনি তোমার প্রতিনিধি হয়ে করেন। তিনি প্রজাদের বাপ, মা, তাঁকে যেন সকল প্রজা বাপ মার মত আমরা ভালবাসিতে পারি, ভক্তি করিতে পারি, রাজভক্ত হইতে পারি। তোমার ভক্ত যে রাজভক্তি শিখিয়ে গেছেন, সকলে যেন, সেইরকম রাজভক্ত হইতে পারি। তাঁকে দীর্ঘজীবী কর। তাঁর ভিতর তোমাকে দেখে নমস্কার করি। রাজা, রাজপুত্র, রাজপরিবার, ও সকল রাজপ্রতিনিধিগণ এবং আমাদেরও সকলকে রক্ষা কর। শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।"

শ্রীব্রহ্মানন্দ নববিধানে যে রাজভক্তি প্রবর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন, বৃদ্ধা মাতার প্রাণে তাহাই সঞ্চালিত হওয়াতে যে এই প্রার্থনা তাঁর হৃদয়ে উঠিয়াছিল, ইহা কে

অস্বীকার করিতে পারেন? এই ভাবে ব্রহ্মানন্দের প্রবর্ত্তিত নববিধানের সকল মত ও বিশ্বাসই তিনি সাধন করিতেন, ইহাও তাহার একটি প্রমাণ।

শ্রীব্রহ্মানন্দের ধর্ম্ম যে অক্ষুণ্ণ ভাবে রক্ষিত এবং তাঁহার মণ্ডলী অখণ্ডরূপে প্রতিষ্ঠিত থাকে ইহা মা সারদা দেবীর ঐকান্তিক আকাঙ্ক্ষা এবং আগ্রহ ছিল। এ সম্বন্ধে তিনি আমাদিগের নিকট কতবারই তাঁহার মনোভাব জানাইয়াছেন। তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র—শ্রীকেশব-অনুজ শ্রীমৎ কৃষ্ণবিহারী সেন মহাশয় যখন প্রেরিত মহাশয়দিগের মিলনের জন্য একান্ত চেষ্টা করেন, মা সারদা সর্ব্বান্তঃকরণে তাঁহার সে চেষ্টার সহায়তা করেন। প্রেরিত মহাশয়দিগের মধ্যে বিবাদ বিসম্বাদে তিনি নিতান্তই দুঃখিত ছিলেন। তিনি কতবারই বলিয়াছেন—"আমার ইচ্ছা হয়, আমি সকলগুলিকে আবার তেমনি করিয়া একত্র দেখি। ওঁদের সকলকার হাতে পায়ে ধরিলে যদি মিটিয়া যায় আর কেশবের কীর্ত্তি বজায় রাখেন, আমি করিতে পারি।"

প্রচারক মহাশয়দিগের কাহাকেও কাছে পাইলে, একেবারে যেন কি রত্ন পাইলেন এইরূপ ভাব প্রকাশ করিতেন। যাঁহারা তাঁহার কাছে না আসিতেন, তাঁহাদের দেখিবার জন্য কতই ব্যাকুলতা প্রকাশ করিতেন। যখনই আমি কাছে যাইতাম তখনই প্রায় প্রত্যেক প্রচারক

মহাশয়ের কথা জিজ্ঞাসা করিতেন, এবং কেবল প্রচারক মহাশয়গণ কেন, বিধান মণ্ডলীর প্রায় প্রত্যেকেরই তিনি খবর লইতেন। মণ্ডলীর মধ্যে বড়দের প্রতিও যেমন, অতি হীন দরিদ্রের প্রতিও ঠিক তেমনি বাৎসল্য ব্যবহার করিতেন। কোন হীন জাতীয় ব্যক্তিকেও কোনরূপ তাচ্ছল্য প্রকাশ করিতেন না। যে কেহ তাঁহার কাছে যাইতেন, তাঁহাকেই প্রায় বলিতেন—"তোমাদের আমি কোথায় পাইতাম? আমার কেশবের লোক তোমরা, আমার কেশবের গুণেই তোমাদের দেখা পেয়েছি।"

শ্রদ্ধাস্পদ কৃষ্ণবিহারী বাবু যখন কতিপয় বন্ধু লইয়া বিশেষ আলোচনা সাধনাদি করিতেন, মা সারদা অধিক রাত্রি পর্য্যন্ত জাগরণ করিয়া সমস্তক্ষণ তাঁহাদের সহিত যোগ দিতেন এবং সকলকে ঠিক আপনার সন্তানের ন্যায় দেখিতেন। সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের সভ্য, বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী সাধক কিম্বা কোন খৃষ্টান পাদ্রী প্রভৃতি যে কেহ তাঁহার নিকট যাইতেন তাঁহাকেই অতি আদরের সহিত তিনি গ্রহণ করিতেন। মা সারদার নিকট ছোট বড়র তারতম্য, দলাদলির ভাব ছিল না।

নানা প্রকার রোগ, শোক, দুঃখ দারিদ্র্যের পেষণে পেষিত হইয়া সকলকার দুঃখের সহানুভূতি করিতেই যেন তিনি পৃথিবীতে দীর্ঘ জীবন যাপন করেন। তাই কাহারো

একটু দুঃখ কষ্ট হইলে একেবারে যেন তাঁর প্রাণ বিগলিত হইয়া যাইত। কাহারো অসুখের কথা শুনিলে শক্তি না থাকিলেও তাঁহাকে দেখিতে ও তাঁহার কাছে গিয়া সেবা করিতে যেন ব্যাকুল হইয়া উঠিতেন। কাহারো অভাবের কথা শুনিলে আপনার কাছে যাহা কিছু থাকিত তাহাই দিয়া তাহার অভাব মোচনের চেষ্টা করিতেন। তাঁহার বৃদ্ধা দাসীকে তিনি প্রাণের সহিত স্নেহ করিতেন এবং সে যাহা চাহিত তাহাই দিতেন। এইরূপে মুক্তহস্তে অনেক খরচ করিতেন বলিয়া তাঁহার যেন ততটা সঙ্কুলান হইত না। এই জন্য শেষ তাঁর কিছু অর্থাভাব হইয়া পড়ে।

আমি একবার তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনার এই অর্থাভাবের কথা মহারাণীকে আপনি বলেন্নি কেন?" তাহার উত্তরে তিনি বলিলেন,—"আহা, মহারাণীর উপর সকলকার ভার, তিনি এত কোথা থেকে পেরে উঠ্‌বেন? তাঁর বড় কষ্ট, তাঁর কষ্ট ভাবলে আমার মনে বড় দুঃখ হয়।" ধন্য মা সারদার সহানুভূতি ভরা দয়ার্দ্র প্রাণ! মহারাণীরও কষ্ট ভাবেন, এমন যাঁর প্রাণ, তাঁর সমান আর কে?

মা সারদার নিকট আমি অতি ক্ষুদ্র কীটানুকীট দীন দরিদ্র, সর্ব্ববিষয়ে হীন, তথাপি তিনি আমাকে অনির্ব্বচনীয় স্নেহ-চক্ষে দেখিতেন। শ্রীব্রহ্মানন্দ-আত্মা

আমাকে নির্দ্দেশ করেন—"আমার মাকে দেখিও", আমি তখন হইতে সর্ব্বদাই তাঁহার সংবাদ লইতে ও যথাসাধ্য তাঁহার সেবার সাহায্য করিতে চেষ্টা করিতে যাইতাম। অতি সামান্য কিছু ফলাদি লইয়া গেলে, তিনি যেন স্বর্গের পারিজাত হাতে পাইলেন, এমন ভাব প্রকাশ করিতেন।

আমি সেই সাহসে অতি সামান্য দুটী ওল কি একটী আনারস এইরূপই কোন না কোন দ্রব্য লইয়া যাইতেও কুণ্ঠিত হইতাম না। তিনি ওল ও তালের গুড় বড় ভালবাসিতেন। আমি যখনই যাইতাম তখনি তিনি গান শুনিতে এবং শ্রীমৎ আচার্য্যদেবের প্রার্থনা শুনিতে চাহিতেন, এবং নিজেও শ্রীমৎ আচার্য্যদেবের প্রার্থনার পর প্রার্থনা করিতেন। পরে আমাকে আহার না করাইয়া প্রায়ই বিদায় দিতেন না। এবং সময়ে সময়ে পাথেয় ও বস্ত্রাদিও দান করিতেন।

একবার মা সারদাদেবীর পীড়ার সময় প্রায় সর্ব্বক্ষণ আমি কাছে থাকিয়া সেবা করি। কঠিন পীড়ার অবস্থাতেও প্রতিদিন মাতৃস্তোত্র এবং শ্রীমৎ আচার্য্যদেবের প্রার্থনা না শুনিলে তাঁহার হইত না। আর কাপড় ছাড়িয়া আহ্নিক না করিয়া কখনই কিছু মুখে দিতেন না। প্রায় শেষ পীড়ার কাল পর্য্যন্ত যখনই সুস্থ থাকিতেন, স্বহস্তেই রন্ধন করিয়া আহার করি-

তেন। এবং আমাদেরও স্বহস্তে রাঁধিয়া প্রসাদ দিতেন।

শেষ পীড়ার আরম্ভে আমি তাঁহার নিকটস্থ হইলে তিনি শ্রীমৎ আচার্য্যদেবের প্রার্থনা শুনিয়া বলিলেন—"প্রিয়, এবার তোমার শরীর খারাপ, তুমি থেকোনা, আমার যদি কিছু বাড়াবাড়ি হয়, আমি খবর দিব। তোমাকে আশীর্ব্বাদ কচ্ছি, তুমি আমার কেশবের ভক্ত, ভক্তের ভক্ত, ভক্তের ভগবান তোমাকে আশীর্ব্বাদ করুন; যেন দীর্ঘজীবি হয়ে, সুস্থ শরীরে থেকে কেশবের ধর্ম্ম তুমি সকলকে দিতে পারো।" একবার আমায় দয়াকরে পত্রও লেখেন, "তুমি ভালো হয়ে ভগবানের কাজ কর এই প্রার্থনা, তোমার মঙ্গল হউক, আশীর্ব্বাদকারিণী ঠাকুমা।" ভক্ত-মাতার এই সকল শুভাশীর্ব্বাদ এ অধম-জীবনে অবশ্যই পূর্ণ হইতে প্রার্থনা করি।

শ্রীব্রহ্মানন্দের পুত্রকন্যাগণের সঙ্গে আমিও তাঁহাকে ঠাকুমা বলিয়াই ডাকিতাম; কিন্তু তাঁহাকে প্রকৃতই ভক্ত-জননীর প্রতিমারূপ দর্শন করিতাম এবং তাঁহার চরণ স্পর্শ করিয়া ও পদধূলি লইয়া আপনাকে ধন্য মনে করিতাম। তাঁহার দেব-মূর্ত্তিতে সত্যই জীবন্ত স্বর্গীয় জ্যোতিঃ প্রতিভাত ইহাই আমি দর্শন করিতাম। বাস্তবিকই তাঁহার দেবচরিত্রে এক অলৌকিক অপার্থিব প্রভাব সর্ব্বদাই আমি প্রত্যক্ষ করিতাম।

তাঁহার শেষ পীড়ার বাড়াবাড়ি হইলে তিনি যে খবর দিবেন বলিয়াছিলেন, সত্যই তিনি এ অধম সেবক সন্তানকে খুঁজিয়াছিলেন, শুনিলাম সে সময় আর কাহারও নাম করেন নাই। তাই তাঁহার পৌত্র-গণ আমাকে সংবাদ পাঠাইয়া দেন, কিন্তু সংবাদ পাইয়া অবিলম্বে তাঁহার দর্শনার্থে গিয়া দেখিলাম, কেবল তাঁহার দিব্য দেহখানি পড়িয়া হাসিতেছে, কিন্তু তাঁহার সেই ভক্ত-জননী-দেবী-আত্মা সেই দিব্য-ধামে চলিয়া গিয়াছেন, বুঝিবা মহাপ্রয়াণের পূর্ব্বে শেষ মাতৃস্তোত্র এবং ভক্তের প্রার্থনা শুনিতেই ও প্রাণভরা আশীর্ব্বাদ করিতে এ অধমকে স্মরণ করিয়াছিলেন। এ সেবকের চির আক্ষেপ যে তাঁর সে সাধ পূরাইবার সৌভাগ্য হয় নাই। প্রয়াণের অব্যবহিত পূর্ব্বে তিনি বলেন, "ঐ যে আমার নবীন কেশব কৃষ্ণবিহারী মাথার কাছে দাঁড়িয়ে আছেন। আর এই যে মা আনন্দময়ী আমায় হাতে ধরে নিয়ে যাচ্ছেন। মা আনন্দময়ী, মা আনন্দ-ময়ী।" এই বলিতে বলিতেই জীবন-দীপ নির্ব্বাপিত হয়। ধন্য সাধ্বীদেবী ভক্ত-মাতা। কিন্তু এ স্বর্গীয় দৃশ্য এ অধমের দর্শন-সৌভাগ্য হয় নাই। যাহা হউক, ভক্তমাতার পবিত্র শ্রাদ্ধবাসরে তাঁহার দিব্য আত্মার নিকট আত্ম নিবেদন করিয়াছিলাম, এবং এখনও করিতেছি—ভক্ত ব্রহ্মানন্দ যে মার গুণে আপনাকে

গুণান্বিত বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন, সেই মাতৃদেবী ধন্য। আবার মাতাও যে ভক্তের "ভাল মাকে" পাইয়া দীর্ঘকালব্যাপী দুঃখ, শোক ভারাক্রান্ত জীবন বহনে সক্ষম হইয়াছিলেন বলিয়া সাক্ষ্যদান করেন ইহাও এই দুঃখ শোক সঙ্কুল পৃথিবীস্থ নরনারীগণের পরম আশার আদর্শ। সংসারের গভীর দুঃখ ভার বহনের উপায় যে সেই ব্রহ্মানন্দের "বড্ড ভাল মা", মা সারদা দেবী তাহাই দেখাইবার জন্য এই দীর্ঘ জীবন বহন করেন এবং তাহাই প্রমাণ করিয়া দিব্যধামে চলিয়া গেলেন। এই মা-সন্তানের পরস্পর মহাযোগ, যাহা পৃথিবীতে স্বীকৃত হইয়াছিল, এখন স্বর্গে তাহা অনন্ত যোগে পরিসমাপ্তি হইয়াছে। মা ভক্ত-জননী আশীর্ব্বাদ করুন যেন সর্ব্বজন সনে এই মা-সন্তানের অনুগমনে আমরা ব্রহ্মানন্দের মাকে দেখিয়া শুনিয়া সংসারের রোগ, শোক, জরামৃত্যুর মধ্যে ব্রহ্মানন্দ লাভে কৃতার্থ ও ধন্য হই। এবং তাঁহার আশীর্ব্বাদে যেন ব্রহ্মানন্দের ধর্ম্ম পূর্ণ মাত্রায় রক্ষা এবং বিস্তার করিয়া জীবনের সফলতা লাভে সক্ষম হই। মা সারদার ন্যায়, ভক্ত-রত্ন আত্মগর্ভে ধারণ করিয়া তাহাই জীবনে যেন প্রসূত করিতে পারি। পৃথিবীস্থ নরনারীগণও যেন এই আদর্শ জীবন গ্রহণ করিয়া দুঃখ নিরানন্দের ভিতর ব্রহ্মানন্দ-জননীকে দেখিয়া ব্রহ্মানন্দের অনুগমনে সংসারে সশরীরে স্বর্গভোগ করে।

পরিশেষে, উপরে যাহা উল্লিখিত করিলাম তাহা মা সারদা দেবীর মহজ্জীবনের আভাস মাত্র। ব্রহ্মানন্দ-রত্ন-প্রসবিনী দেবী মা সারদার আত্মবিবরণ পাঠেই জগজ্জন তাঁহার দেবত্বের সম্যক পরিচয় পাইবেন। তাহাই সকলে পাঠ করিয়া ব্রহ্মানন্দ-জীবন নিজ নিজ জীবনে প্রতিফলিত করিতে সক্ষম হউন ইহাই প্রার্থনা করি। যিনি এই পবিত্র আত্মবিবরণী লিপিবদ্ধ করিয়া প্রকাশ করিতেছেন ভক্ত-জননীর অজস্র শুভাশীর্ব্বাদ লাভে তিনিও ধন্য হউন।

সেবক শ্রীব্রহ্মানন্দ দাস।

নিবেদন

আমার ভক্তিভাজন পরলোকগত শ্বশুর মহাশয়ের (কৃষ্ণবিহারী সেনের) এবং ভক্তিভাজন পরম ভক্ত কোনও প্রচারকের বিশেষ অনুরোধে আমি এই জীবনী লিখিতে প্রবৃত্ত হই। ভক্তিভাজন প্রচারক মহাশয় আমাকে এই বলিয়া উৎসাহিত করেন যে, "তোমার দিদি মোহিনী ও তোমার দেশের প্রচারক প্যারীমোহন যেমন আচার্য্যদেবের প্রার্থনা এবং উপদেশ লিখিয়া পৃথিবীকে উপহার দিয়াছেন, সেই রকম তুমিও আচার্য্যমাতার জীবনী লিখিয়া নিজে ধন্য হও ও জগতের উপকার কর।" উপরি উক্ত উপদেশ বাস্তবিক আমার মনঃপূত হইয়াছিল। তাহার পরেই আমি ঠাকুরমাকে তাঁহার জীবনী বলিবার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করি। তিনি প্রথমে কিছুতেই স্বীকৃত হয়েন নাই। "আমার আবার জীবন-চরিত কি?" এই বলিয়া উড়াইয়া দিতে চেষ্টা করেন। তার পর তাঁহাকে আমি এবং অন্যান্য আরও অনেকে বুঝাইয়া সম্মত করি। তাঁহাকে এই বলিয়াছিলাম যে, "আপনার জীবনী আপনার সম্পত্তি নয়, সহস্র বৎসর পরে জগতের লোক যখন আপনাকে খুঁজিবে, এবং আপনার সম্বন্ধে নানারূপ

সত্য মিথ্যা কল্পনা করিবে, তখন আপনি এই জন্য ভগবানের নিকট এবং জগতের লোকের নিকট দায়ী হইবেন। অবশেষে আমার অনেক অনুনয় বিনয়ের পর ঠাকুরমা তাঁহার জীবনবৃত্তান্ত বলিতে আরম্ভ করেন। তিনি যখন তাঁহার জীবনী বলিতেন, তখন সেইখানে তাঁহার কন্যা প্রভৃতি সকলেই উপস্থিত থাকিতেন। জীবনবৃত্তান্ত বলিবার আগে তিনি আমাকে এই অনুরোধ করেন, যেন তাঁহার জীবদ্দশায় এবং মৃত্যুর অনেক দিন পরেও এই লেখা বাহির না হয়। প্রথম অনুরোধ আমি রক্ষা করিয়াছি, কিন্তু শেষ অনুরোধ ভক্তিভাজন ৺গিরীশচন্দ্র সেন মহাশয়ের আদেশে রক্ষা করিতে পারি নাই।

সারদাদেবী যখন এ জীবনী বলিতেন এবং আমি যখন ইহা লিখিতাম, তখন আমি ইহাকে একটি পবিত্র ধর্ম্মগ্রন্থ বলিয়া মনে করিতাম, এবং সমসাময়িক সমুদায় লোককে ভুলিয়া সহস্র বৎসর পরে নববিধানাশ্রিত লোকের দিকে দৃষ্টি স্থির রাখিয়া লিখিতাম; সারদা-সুন্দরীকে ঠাকুরমা না মনে করিয়া কেশবজননীরূপে দেখিতাম, আমি নিজেকে সহস্র বৎসর পরের একজন কেশবপন্থী বলিয়া মনে করিতাম। ইহা দ্বারা সকলেই বুঝিবেন সারদাসুন্দরীর জীবনের প্রত্যেক ক্ষুদ্র বৃহৎ ঘটনাবলী, তাঁহার ধর্ম্মমত, তাঁহার সংসারে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র

বিষয় এবং তাঁহার পুত্র কন্যা ইত্যাদি সম্বন্ধীয় সমস্ত বিষয় কত আবশ্যকীয়, কত মূল্যবান, এবং কত মনোহর মনে করিতাম! এই সঙ্গে আর একটী কথা বলি, সারদাসুন্দরীর মধুর প্রকৃতির বিষয় অনেকেই অবগত আছেন, কিন্তু তাঁহার জীবনগ্রন্থ লিখিতে লিখিতে আমি তাঁহার সত্যনিষ্ঠা দেখিয়া একেবারে অবাক্ হইতাম। তিনি কি আশ্চর্য্য সত্যপরায়ণা ছিলেন! তিনি সত্য ঘটনা সমুদায় বলিবার সময় এমন করিয়া বলিতেন যেন ইহা দ্বারা কাহারও মনে আঘাত না লাগে। প্রথমতঃ আমি তাঁহার কথানুসারে জীবনী লিখিয়া যাইতাম। লিখিবার পরই আবার সেইটী তাঁহাকে পড়িয়া শুনাইতে হইত। যদি কোনও স্থানে একটী কথার ব্যতিক্রমের জন্য তাঁর মনের ভাব ও ভাষার মধ্যে বিভিন্নতা প্রকাশ পাইত, তখনই তাহা কাটাইয়া, যতক্ষণ পর্য্যন্ত তাঁহার ভাব ও ভাষা ঠিক না হইত ততক্ষণ পর্য্যন্ত তিনি কোনও রকমে স্থির হইতেন না। বলিতেন, "না ভাই, ঐটী ঠিক হইল না, কাট।" ইহাতেই বুঝিবেন তাঁহার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে তিনি একবিন্দুও মিথ্যা এ জীবনীতে আসিতে দেন নাই। ইহার পর তাঁহার পুত্র কন্যা ও নাতি নাতিনীদের ও কুচবিহারের বিবাহের বিষয় যাহা তিনি নিজে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাহা তিনি তাঁহার নিজের সরল ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন, আশা-

করি তাহা পড়িয়া সকলেরই মন আকৃষ্ট হইবে এবং বিরোধী ভাব অনেক পরিমাণে দূর হইবে। সকলের নিকট আমার এই বিনীত প্রার্থনা যে, কেশবজননীর জীবনী পাঠ করিবার সময় আমরা যে তাঁর সমসাময়িক লোক এই ভাবটী যেন ভুলিয়া যাই। এই সঙ্গে আমার আর একটি বিশেষ নিবেদন এই যে, কেশব-জননী, কেশবচন্দ্র, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ও প্রেরিতগণ আমাদের পিতামাতা কিংবা অন্যান্য নিকট আত্মীয় এ কথাটী যেন আমরা আরও বিশেষ করিয়া ভুলিতে চেষ্টা করি। কারণ, শেষে যখন আমাদের চিহ্ন মাত্রও থাকিবে না, তখন তাঁহাদের জীবনের ক্ষুদ্র বৃহৎ ঘটনার ভিতর দিয়া জগতের ইতিহাস ফুটিয়া উঠিবে। যদি এ জীবনীতে আপাততঃ কাহারও অপ্রিয় ঘটনা প্রকাশিত হয় তাহা হইলে জগতের ভবিষ্যৎ ইতিহাসের দিকে তাকাইয়া সারদাসুন্দরী ও তাঁহার এই অনুগত দাসকে যেন ক্ষমা করা হয়।

সারদাদেবীর জীবনের অনেক ক্লেশকর ঘটনা ছিল, এবং তিনি তাহা সব সময় বলিতেন, কিন্তু জীবন-চরিতে তিনি তাহা লিখিতে স্বীকৃতা হন নাই ;—পাছে ইহা দ্বারা কাহারও প্রাণে আঘাত লাগে। সুতরাং তাহা অপ্রকাশিত রহিল। ঐ সব বিষয় বলিলে তাঁহার জীবনটী আরও সুন্দর রূপে প্রকাশিত হইত।

ভক্তিভাজন ৺ গিরীশচন্দ্র সেন লিখিয়াছিলেন :—
"আচার্য্যের জননীর নিজমুখে বিবৃত আত্মজীবন-বৃত্তান্ত একপ্রকার ঐতিহাসিক কাহিনী। তিনি নিজে না বলিলে ইহার অধিকাংশ আমাদের জানিবার উপায় ছিল না। নিজের সদ্‌গুণ ও উচ্চভাব সকল কে নিজে বলিয়া থাকে? ঐতিহাসিক বিবরণ আরও কিছু অবশিষ্ট থাকিলে তাহা প্রকাশ করিয়া মাতার স্বাভাবিক বৈরাগ্য ও দীনতা, ভগবদ্ভক্তি, প্রার্থনাশীলতা, পরসেবা ও গৃহকর্ম্মনৈপুণ্য ইত্যাদি তাঁহার জীবনের অসাধারণ সদ্‌গুণ সকল পরিষ্কার রূপে লিখিয়া যোগেন্দ্রলাল বা সরলাদেবী জীবনীর উপসংহার করেন, এবং তাহা পুস্তিকার আকারে প্রকাশ করিয়া, বঙ্গমহিলাদের হিতার্থ প্রচার করেন ইহা একান্ত প্রার্থনীয়।"

সারদা দেবীর রাজভক্তির বিষয় অনেকে জানিতেন না। কারণ, উহা তাঁহার লোক দেখান বিষয় ছিল না। উহা তাঁহার ধর্ম্মের অঙ্গস্বরূপ ছিল। রাজভক্তি সম্বন্ধে অতি শৈশবাবস্থা হইতে তিনি নাতি নাতিনীদের সর্ব্বদা উপদেশ দিতেন। কুচবিহারের মহারাজা যখন প্রথম সেন পরিবারে আসেন, সারদা দেবী তখন আমার পত্নী এবং অন্যান্য মেয়েদের বলিয়াছিলেন, "রাজদর্শন যখন তখন করিতে নাই। বিশেষ দিন দেখিয়া এবং অতি ভক্তিভাবে রাজদর্শন করিতে

হয়।" তিনি আমাদের সম্রাটকে ভগবানের প্রতিনিধি রূপে দেখিতেন। এই সম্বন্ধে ভক্ত প্রিয়নাথ এক দিন যাহা গোপনে দেখিয়াছিলেন, পাঠক তাহা সাধক প্রিয়নাথের লেখাতেই দেখিতে পাইবেন।* ছেলে-মেয়েরাও শৈশবকাল হইতেই মাতা সারদা দেবীর এইভাবে অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন এবং শেষে তাঁহাদের, বিশেষ ছেলেদের বাক্যে, মতে ও লেখাতে তাহা নানা ভাবে প্রকাশ পাইয়াছিল।

শেষ একটী কথা বলিয়া আমার নিবেদন শেষ করিব,—সেইটী পুত্রের উপর মাতার প্রভাব। সারদা-সুন্দরী যদি মাতা রূপে কেশবের ধর্ম্মকে পূর্ণ জাতীয় ভাবে বরণ করিয়া না লইতেন, তাহা হইলে এই চির সত্য নব ধর্ম্মকে আমরা হয় ত অন্য সাজে সজ্জিত দেখিতাম। কালপ্রসূত কুসংস্কার ও আবর্জ্জনার ভয়ে ভীত ব্রাহ্মসমাজ ত কেশবকে অগ্রণী করিয়া পূর্ণবেগে পশ্চিমাভিমুখে ধাবিত হইবার চেষ্টায় ছিলেন। এই ঘোর পরিবর্ত্তনের দিনে, নূতন জাতীয়তার উষাকালে, নূতন জাতীয়তার প্রতিনিধিরূপে মা যেন অগ্রসর হইয়া কেশবকে বলিলেন, "বাবা কেশব, এইবার এক বার নিজের গৃহের দিকে দেখ, পরম ব্রহ্ম শ্রীহরির

* শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ মল্লিক লিখিত সারদাদেবীর আত্মকথার ভূমিকা দেখুন। যোঃ।

কৃপায় ও ভারতব্যাপী মহাব্রহ্ম ধ্বনিতে এখন আর সেই দেশ ও সেই গৃহ নাই ;—ফিরে এস।" মাতার ভাবে ভগবানের ইঙ্গিত দেখিয়া কেশব ফিরিলেন। মা বরণ করিয়া নব ধর্ম্ম সহ কেশবকে গৃহে লইলেন। নবসংহিতা জাতীয় ভাবে সজ্জিত হইলেন। তাই বিবাহে, জাতকর্ম্মে, শ্রাদ্ধাদি নিত্যকর্ম্মে, সংস্কৃত দেশীয় আচরণ দেখিতে পাই। তাই বিবাহে—"আশীর্ব্বাদ, "পত্র", "গাত্রহরিদ্রা", "অধিবাস", "বরণডালা", "ফুলশয্যা", মৃতে অশৌচ, "উত্তরীয় ধারণ" ইত্যাদি ; পরিবারে পরিবারে ব্রত নিয়মাদির, এমন কি আঁতুড়ে—"আট্ কৌড়ে" পর্য্যন্ত বর্জ্জিত না হইয়া সংস্কৃত ভাবে গৃহে গৃহে গৃহীত হইয়াছে ; জাতীয় উৎসবরূপে সমাজের বিশুদ্ধ আনন্দ বর্দ্ধন করিতেছে। তাই—

"আট্কৌড়ে বাট্কৌড়ে
ছেলে আছে ভাল।
মার কোল জোড়া হয়ে
বাপের ———।"

পরিবর্ত্তে মায়ের নিকট দণ্ডায়মান হইয়া কেশব ছেলেদের কুলো বাজাইয়া আঁতুড় ঘরে গাইতে শিখাইলেন—

"আট্কৌড়ে বাট্কৌড়ে
ছেলে আছে ভাল।

সবে মিলে আনন্দেতে
টাকা কড়ি ফেল॥"

এইরূপে মাতার সাহায্যে নব সমাজকে জাতীয় ভাবে কেশব নূতন জাতীয়তার সম্মুখে ধরিলেন। জাতীয় একটী অনুষ্ঠানও বাদ দিলেন না। যেখানে যে সংস্কারটুকু দরকার, সুধু তাই করিয়া লইলেন। যা না হইলে ছেলেদের কোন গৃহকর্ম্ম ও অনুষ্ঠানই সম্পন্ন হইত না। সে সম্বন্ধে চিরকালই ছেলেরা যে সারদা-সুন্দরীর আঁচল ধরা, সেন পরিবারের সংসর্গে যাঁহারা আসিয়াছেন তাঁহারাই ইহা সহস্রবার স্বীকার করিবেন। নবধর্ম্মের নবানুষ্ঠানদিতেও সারদা দেবী নিজের স্থান অধিকার করিলেন। ব্রহ্মযোগী শ্রীকেশব কাল সহকারে পূর্ণতা লাভ করিয়া তাঁহার যোগফল স্বরূপ শ্রীশ্রীনববিধানকে যখন "ব্রাহ্মধর্ম্ম" বা "ব্রহ্মজ্ঞান"-রূপ পদ্মাসনে স্থাপন করিয়া জগৎ সমক্ষে উপস্থিত করিলেন, মাতা সারদাসুন্দরীই ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে অগ্রসর হইয়া তাহাকে জাতীয় বস্ত্রালঙ্কারে সজ্জিত করিয়া নিজে ধন্যা হইলেন ও দেশের পরম কল্যাণ সাধন করিলেন। আমি বিশ্বাস করি ভবিষ্যৎ বংশীয়গণ এই জন্য সারদা-সুন্দরীর নাম একদিন কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ করিবেন।

সারদা সুন্দরীর দৃঢ়চিত্ততার কথা বলিব না; তাঁহার জীবনী হইতেই চিন্তাশীল পাঠকগণ ইহা

দেখিতে পাইবেন। তাঁহার কোমল হৃদয়ের কথা ত অনেকে জানেন। সামান্য চাকরচাকরাণীর কষ্টও তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না। তাহাদের অধিক খাটিতে দেখিলে নিজেই তাহাদের হইয়া খাটিতে যাইতেন। বৃদ্ধ বয়সে চাকর চাকরাণীর সাহায্য করিতে যাইয়া নিজের হস্ত পদ পর্য্যন্ত ভগ্ন করিয়াছিলেন, এইরূপ দেবী তুল্য মনিবের তারার* ন্যায় ভক্তিমতী দাসী হইবে আশ্চর্য্য কি? দেবী সারদাসুন্দরীর আধ্যাত্মিকতা এবং ধর্ম্মনিষ্ঠা কিরূপ ছিল তাহা তাঁহার আত্মকথা এবং প্রচারক মহাশয়গণের ভূমিকা ও অভিমতাদি হইতেই পাঠক অবগত হইতে পারিবেন। নিম্নে তাঁহার নিত্য-উপাসনার প্রধান অঙ্গীভূত ব্রহ্মসঙ্গীতটী উদ্ধৃত করিয়া দিলাম:—

কাতরে তোমায়, ডাকি দয়াময়,
হইয়ে সদয়, দাও দরশন।
পূরাও মনসাধ, ঘুচাও হে বিষাদ,
দিয়ে সুশীতল অভয় চরণ।
সংসার তাপে তাপিত হয়ে,
লয়েছি শরণ তোমার আশ্রয়ে।
কৃপাবারি দানে, বাঁচাও হে প্রাণে,
অধম সন্তানে দেখ চাহিয়ে।

---

* ৫২ পৃষ্ঠা দ্বিতীয় প্যারা দেখুন। যোঃ।

গতিহীন জনে, তোমা বিহনে,
আপনার ব'লে কে আর চাহিবে।
সন্তাপ হর, কৃতার্থ কর,
অভয় দানে আমাদের সবে।
তুমি গুণনিধান, সর্ব্বশক্তিমান,
কল্যাণ বিধান কর নিরন্তর।
করুণা তোমার, হলে একবার,
অনায়াসে পার হই ভবসাগর।
অনাথ দুর্ব্বল, নাহিক সম্বল,
তুমিই আমাদের ভরসা কেবল।
তৃষিত হৃদয়ে ব্যাকুল হ'য়ে,
করি ভিক্ষা—নাথ, দাও পুণ্যবল।
সুখ-সম্পদে দুঃখ-বিপদে যেন,
তোমাতে থাকে হে মতি।
ইহ-পরকালে, তব-পদতলে,
নির্ভয় মনে করিব বসতি।
যেন হে সবে, মিলে সদ্ভাবে,
নিত্য এই ভাবে করি অর্চ্চনা।
অকিঞ্চন হ'য়ে, এক হৃদয়ে,
হে প্রভু, তোমার করি সাধনা।*

---

* মল্লার—একতালা।

সারদা দেবীর আত্মকথা তাঁহার মুখ হইতে শ্রবণ করিয়া আমি কিরূপে তাহা তাঁহার সম্মুখেই লিপিবদ্ধ করিতাম তাহা উপরে বর্ণিত হইয়াছে। এই জীবনীই শেষে আমার পত্নী শ্রীমতী সরলা দেবী অতি পরিশ্রম সহকারে নকল করিয়া কলিকাতার "মহিলা" পত্রিকায় প্রকাশ করিয়াছিলেন। এক্ষণে উহা বন্ধুদের ও অনেক ভক্তিভাজন গুরুজনের অনুরোধে পুস্তকাকারে মুদ্রিত করিয়া শ্রীকেশবচন্দ্রের দেশবাসীর, বিশেষ নববিধান-পন্থী ভবিষ্যৎ বংশীয়দের শ্রীকরকমলে শ্রদ্ধার সহিত অর্পণ করিলাম। ইহাতে যাহা কিছু ক্রটি ও অভাব দৃষ্ট হইবে তাহা সমস্তই আমার। পুস্তকাকারে মুদ্রিত করিবার সময় অনেক গুরুজনের অনুরোধে দুই একটী স্থান পরিবর্জ্জন করিয়াছি।

পরিশেষে, যাঁহারা আমাকে এই কার্য্যে সহায়তা করিয়াছেন তাঁহাদিগকে, বিশেষতঃ ঢাকাস্থ সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজের কর্ম্মী ভারত-মহিলা প্রেসের স্বত্বাধিকারী বন্ধুবর শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়কে মুদ্রাঙ্কণ কার্য্যে বিশেষ সাহায্যের জন্য অগণ্য ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা অর্পণ করিয়া আমার নিবেদন শেষ করিলাম।

ঢাকা, উয়ারী
৩১শে ডিসেম্বর, ১৯১৩ইং।

শ্রীযোগেন্দ্রলাল খাস্তগীর।

নির্ঘণ্ট

বিষয়	পৃষ্ঠা
ভূমিকা (সাধক প্রচারক ভাই প্রিয়নাথ মল্লিক)	৵০
নিবেদন	১৵০
জন্ম, বাপের বাড়ী, পিতা, ভাই, বোন, বিবাহ, বাল্যাবস্থা ও শ্বশুরবাড়ী ...	১
শ্বশুর দেওয়ান রামকমল সেন ও তাঁহার ভ্রাতা, কন্যা ও সন্তান ইত্যাদি ...	৪
স্বামী প্যারীমোহন সেন	১১
স্বামীর স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে মত এবং সারদাসুন্দরীর শিক্ষা	১৩
বিধবাবস্থার দুঃখের কথা	২২
শ্রীক্ষেত্রে ও পথে বিষপ্রয়োগ	২৫
ধর্ম্মমত	৩১, ৫৭
গঙ্গাসাগর যাত্রা	৩৪
নৌকায় শিশু কৃষ্ণবিহারীর দুর্ঘটনা ...	৩৫
বড় ও মেজ মেয়ের বিবাহ	৩৫
শাশুড়ী, ননদ বিন্দু ও বড় মেয়ে ব্রজেশ্বরীর মৃত্যু	৩৭
বড় ছেলে নবীনের বিবাহ	৩৮

সেজ মেয়ে চুণী ও ছোট মেয়ে পান্নার বিবাহ ... ৪০
মেজ ছেলে কেশবের বিবাহ ... ৪১
কাশী, প্রয়াগ, বৃন্দাবন, মথুরা ও বিন্ধ্যাচল ভ্রমণ ৪৫, ৪৯, ৫২
কাশীতে রোগ ৪৬
উটের গাড়ীতে দুর্ঘটনা ৪৬
নৈনীতাল, মুশুরী পাহাড়, লাহোর, লক্ষ্ণৌ, অমৃতসর, কুরুক্ষেত্র দর্শন ৫৩
গুহ্যপানী ও নালাপানীতে এবং লাহোরের পথে দুর্ঘটনা ৫৪
তীর্থ ভ্রমণের উদ্দেশ্য ৫৫
কুরুক্ষেত্র হইতে কাশীর পথে বিপদ ও অপরিচিত একটী ব্রাহ্মণ-শিশুর অযাচিত রূপে আশ্চর্য্য সাহায্য ৫৬
কুচবিহারের গুজরাটী রাণী ৫৬
জয়পুরে গোবিন্দজী দর্শন ও আশ্চর্য্য ঘটনা এবং সারদাসুন্দরীর ধর্ম্মমত ... ৫৭
বিষয় বিভাগ ৫৮
পুত্র কন্যা—প্রথম ছেলে নবীন ... ৬৩
তৃতীয় সন্তান (দ্বিতীয় পুত্র) কেশব ... ৬৪
কেশবের মূর্চ্ছা রোগ ৪৫
কেশবের আঘাত দ্বারা মেজ মেয়ের চোখ নষ্ট ৪৬

কেশব কি খাইতে ভালবাসিতেন ; কেশবের ভাইভগ্নী ও শিশু-সেবা ... ৬৮
কেশবের ব্রাহ্মসমাজে যোগদান ও সারদা-সুন্দরীর কষ্ট ৬৯
কেশবের রোগ-যন্ত্রণা ও সারদাসুন্দরী ... ৭১
আদেশ ও দৃষ্টি ৭৩
কনিষ্ঠ-পুত্র কৃষ্ণবিহারী ৭৬
উপেন্দ্রনাথ সেন, কৃষ্ণবিহারী ও বিহারী-লাল গুপ্ত ৭৮
কৃষ্ণবিহারী সেনের বিলাত যাওয়ার সংকল্প ত্যাগ ৭৮
কৃষ্ণবিহারী সেনের বিবাহ ৭৯
কৃষ্ণবিহারী সেন, আনন্দমোহন বসু ও তাঁহাদের পত্নীদ্বয়ের ব্রাহ্মসমাজে দীক্ষা ৮০
কেশবের ছেলেবেলাকার পরীক্ষা-গৃহের গোলমাল ও তাঁহার উপর অন্যায় দোষারোপ ৮২, ৮৩
কৃষ্ণবিহারী সেনের সাধন ও তীর্থ-সঙ্গীত ৮৪
কৃষ্ণবিহারী সেন কোন্ কোন্ ভাষায় পণ্ডিত ছিলেন এবং কি নিয়মে নানা ভাষার পুস্তক পাঠ করিতেন ৮৬, ৮৭
মহারাণী সুনীতি ৮৯

কুচবিহারের বিবাহ … …	৮৯, ৯৩
বৌরা … … …	৯৩
প্রচারকগণ … … …	৯৩
নাত্‌বৌরা (মোহিনী ও সরযূবালা) …	৯৪
৺ রামকৃষ্ণ পরমহংস … …	৯৬
লেডি ডফারিণ … …	৯৮
সারদাসুন্দরীর শেষ জীবনে মনের অবস্থা …	১০০
উপসংহার … … …	১০১, ১০৪
কতকগুলি চিঠি :—	
বেলাবতী সেন … …	১০০
জ্যোতিঃপ্রকাশ সেন … …	১০২
স্বর্গীয়া সারদাসুন্দরী সম্বন্ধে কয়েকখানা পত্র ও মতামত :—	
নববিধান-প্রচারক স্বর্গীয় গিরীশচন্দ্র সেন	১০৪
শ্রদ্ধাস্পদ স্বর্গীয় চণ্ডীচরণ সেন (সি, সেন)	১০৮
স্বর্গীয় প্রতাপচন্দ্র মজুমদার ও Rev. T. T. Sunderland … …	১১২
ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত কান্তিচন্দ্র মিত্র …	১১৪
,, ,, প্যারীমোহন চৌধুরী	১১৫
,, ,, দীননাথ মজুমদার…	১১৭
,, স্বর্গীয় গিরীশচন্দ্র সেন …	১২০
,, শ্রীযুক্ত দুর্গানাথ রায় …	১২১

ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত বঙ্কচন্দ্র রায় ... ১২৪

পরিশিষ্ট (ক) দেওয়ান রামকমল সেন ও প্যারীমোহন সেনের উইলের নকল ... ১২৫

" (খ) "The struggle and the Triumph" or the last chapter of Keshab's life by late Krishna-Behari Sen ... ১২৪

(গ) "কৃষ্ণবিহারী সকল বিষয়ে কেশবের ছোট ভাই"— উমানাথ গুপ্ত ... ১৩২

(ঘ) Sir Alfred Croft C.C I.E. M. A. on the late Babu Krishna Behari Sen, Convocation Speech of 1195–96. ... ১৩২

(ঙ) Extract from the late Krishna Behari Sen's diary ১৩৫

সারদাদেবীর আত্মকথায় উল্লিখিত কতকগুলি বিষয় ও ব্যক্তির পরিচয় ১৩৭

ভুল সংশোধন

পৃষ্ঠা	লাইন	ভুল	সংশোধন
৩৬	৪	"রায়ের দুর্য্যোদাসের	রায় দুর্য্যোদাসের
৩৯	৪	"হইয়াছিলেন"	হইয়াছিল
৪০	১	"চুণার"	চুণীর
৪১	১০	"মেয়েকে"	মেয়ের
৪১	১০	"পা"	গা
৪৪	১১	"যে এক সঙ্গে"	এই তিনটী কথা বাদ দিয়া পড়ুন
৪৭	৩	"গাড়ীর"	গাড়ী
৬৩	১০	"যখনও"	কখনও
*৬৩	৩ ফুটনোট	"পাতবাদাম ওয়ালীর"	পাতবাদাম ওয়ালার



দেওয়ান রামকমল সেন

(জন্ম—১৭৮০ মৃত্যু—১৮৪৪)

স্বর্গীয় প্যারীমোহন সেন

(জন্ম—১৮১৪ মৃত্যু—১৮৪৮)

স্বর্গীয়া সারদাসুন্দরী দেবী

(জন্ম—১৮১৯ মৃত্যু—১৯০৭)

কেশবজননী দেবী সারদাসুন্দরীর আত্মকথা।

প্রথম দিবস—২রা জুন, ১৮৯২।

আজ ১৮৯২ খৃষ্টাব্দের ২রা জুন। প্রায় ৭৩ বৎসর পূর্ব্বে ত্রিবেণীতে আমার মামার বাড়ীতে আমার জন্ম হয়। আমি গৌরিভায় মানুষ হই, গৌরিভাতেই আমার বাপের বাড়ী। আমার বাবার নাম গৌরহরি দাস। আমরা চারি বোন, এক ভাই। আমার ভাই খুব বিদ্বান ছিলেন। তিনি বিন্ধ্যাচলে কর্ম্ম করিতেন। আমার বাবা জাতীয় চিকিৎসা ব্যবসা করিতেন। তিনি বড় ধার্ম্মিক ছিলেন। আমার ভাইএর যোগের কথা শুনিয়াছিলাম, দেখি নাই, মার মুখেই শুনিতাম মাত্র। কিন্তু শেষে আপন ঘরে নিজের চক্ষে সেই যোগ দেখিয়াছিলাম। আমার ৯ বৎসর বয়সে বিবাহ হয়। হিন্দুর নিয়ম মত এক বৎসর বাপের বাড়ী ছিলাম। তারপর ১০ বৎসর বয়সে শ্বশুর বাড়ী আসি। শ্বশুরবাড়ী

ও বাপের বাড়ী এ পাড়া ও পাড়া বলিলেই হয়। বাবা আমার বিবাহের পর আমায় শ্বশুর বাড়ী রাখিয়া কাশী-ধামে গিয়াছিলেন। শ্বশুর বাড়ী আসিবার পূর্ব্বে আমার বড় ভয় হইত, মনে হইত, কোথায় যাইব। ভাবিতাম যেন আমায় কয়েদ করিবে, কিম্বা ফাঁসি দিবে। এই ভাবিয়া এক মাস পর্য্যন্ত কাঁদিয়াছিলাম। শেষে আমার বাবা জোর করিয়া যখন শ্বশুর বাড়ী রাখিয়া গেলেন তখন মনে হইল যেন আমায় জলে ফেলিয়া দিলেন। যদিও বহুদিন হইতে মনে করিতাম, আমাদের এই সব হিন্দু নিয়ম খুব ভাল, কিন্তু এখন দেখিয়া শুনিয়া মনে হয়, বেশ বড় হইয়া বিবাহ হইলেই ভাল ; কেন না, তাহা হইলে আর এই সব কষ্ট সহ্য করিতে হয় না। প্রথম শ্বশুরবাড়ী আসিয়া যখন এক এক জনের মুখ পানে চাইতাম, আমার এক এক পোয়া করিয়া রক্ত শুকাইয়া যাইত। ভয় হইত, কে কি বলিবেন। আমি তিন সন্তানের মা হইলাম, তখন পর্য্যন্ত আমার ভয় ছিল। শাশুড়ীর মুখপানে তাকাইতে ভয় হইত। আমার শাশুড়ী কত ভাল ছিলেন, কিন্তু একটু রাগ বেশী ছিল। আমার দুর্ভাগ্যবশতঃ তিনি প্রথমে আমায় ভাল চোখে দেখেন নাই, বোধ হয় সে আমার দোষ। তাঁর এক প্রকার বিশ্বাস ছিল, তখন আমার দশ বৎসর হইতে অনেক বেশী বয়স। আমার একটু দোষ দেখিলেই তিনি

আমার শ্বশুরকে বলিয়া দিতেন, এবং আমায় বকুনি খাওয়াইতেন। যদি আমরা দু চারজন সমবয়সী একত্র বসিয়া খেলা করিতেছি দেখিতেন, তাঁহার রাগ হইত। আমরা একটু এ ঘর ও ঘর করিলে তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না। আমরা ভয়ে কাঁপিতাম। আমরা চার জা ছিলাম। আমার বড় জা (জয়পুরের যদুনাথ সেন ও নরেন্দ্রনাথ সেনের * মা) ও আমি একত্রে ঘর করিয়াছি। আমার সঙ্গে তাঁহার বেশ ভাব ছিল। সংসারের কাজ আমরা দু'জনে ভাগ করিয়া করিতাম। তিনি আমার চেয়ে দুই বৎসরের বড় ছিলেন। কিন্তু আমরা সংসারের কাজ এক সঙ্গেই আরম্ভ করি। আমাদের অনেক দাস দাসী ছিল, কিন্তু আমার শাশুড়ী দাসীকে ঘরে আসিতে দিতেন না। সেই বড় বড় ঘরগুলি আমাদের ধুইতে হইত। কোন রকমে কষ্টে স্রেষ্টে যদি ধুইতাম, কিন্তু ন্যাকড়া দিয়া মুছিতে পারিতাম না, অত বড় ঘর মুছিবার ন্যাকরা হাতে ধরিতে পারিতাম না। সমস্ত দিন এইরূপ কাজ করিতে করিতে এক এক বার খেলা করিতে ইচ্ছা হইত, কিন্তু একটু খেলা করিতে দেখিলেই শাশুড়ী বিরক্ত হইতেন। এখন যেমন মেয়েরা স্বচ্ছন্দে লেখাপড়া করিতে পারে, এবং কত ভাল ভাল

* ইনি হাইকোর্টের প্রসিদ্ধ এটর্নি ও ইণ্ডিয়ান মিররের সম্পাদক রায় নরেন্দ্রনাথ সেন বাহাদুর।

বিষয় শিক্ষা পায়, আমাদের এ সকল কিছুই ছিল না, সুতরাং এক একবার খেলা করিতে ইচ্ছা হইত। আমার ছোট খুড়ত শ্বশুরের বড় মেয়ের (সিভিল সার্জ্জন গোপাল রায়ের * মা) সঙ্গে আমার বড় ভাব ছিল, তাঁর সঙ্গেই আমি খেলিতাম। এগার বৎসর বয়সে আমার দীক্ষা হয়, দীক্ষার পরই আমি পূজা করিতে শিক্ষা করি। বিবাহের পরে এবং দীক্ষার পূর্ব্বে আমি ধর্ম্মসম্বন্ধে কোনও বিশেষ উপদেশ পাই নাই; কিন্তু বিবাহের পূর্ব্বে ছেলেবেলায় আমার মা আমায় ব্রত উপবাস ইত্যাদি করাইতেন। মার উপদেশই বেশ ভাল লাগিত। তিনি শাশুড়ীর সেবা ইত্যাদি করিবার নিমিত্ত উপদেশ দিতেন, এবং শিখাইতেন। আমিও যতদূর সাধ্য শাশুড়ীর সেবা করিয়াছি, কিন্তু স্বামীর সেবা এবং শ্বশুরের সেবা করিতে পারিতাম না। কারণ, সেই সময়ে এই সব কাজ মহৎ হইলেও করিতে দেখিলে লোকের নিকট নিন্দনীয় হইতে হইত। শ্বশুরের সেবা করিতে আমার অত্যন্ত ইচ্ছা হইত, কিন্তু অনেক কারণে ভালরূপ হইয়া উঠিত না। তিনি প্রথমতঃ কাহারও সেবা লইতে ভাল বাসিতেন না। কেবল তাঁহার এক বিধবা কন্যা এই বিষয়ে পরম ভাগ্যবতী ছিলেন। এই মেয়ে তাঁহার সেবা করিত, এবং তিনিও কেবল ইঁহার

* ইনি ইণ্ডিয়ান মেডিকেল সার্বিসের একজন কর্ণেল্ ছিলেন।

সেবামাত্র গ্রহণ করিতেন। তাঁহার এই মেয়ে অতি ছেলে বয়সে বিধবা হইয়াছিলেন (১৪ বৎসরে), সেবার দ্বারা ইঁহার মন ভাল থাকিবে বলিয়া তিনি ইঁহার সেবা লইতেন। তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে আমিও যৎকিঞ্চিৎ সেবা করিতে সমর্থ হইতাম। তিনি সকাল বেলায় কুঠীতে যাইবার সময় তাঁহার সেই মেয়েকে টাকা দিয়া বলিতেন, "বিন্দু. এই টাকা নিয়ে তোমাতে ও তোমাদের বৌ'য়েতে মিলে আমার জন্য খাবার ক'রো," আমাকেও কখন কখন বলিতেন। আমরা সমস্তদিন এই আমোদে থাকিতাম ; সমস্ত দিন বসিয়া খাবার করিতাম। এই উপায়ে তাঁহার মেয়ের মন সকল সময় অন্যমনস্ক থাকিত। অক্রূর বলিয়া আমাদের এক চাকর ছিল। তাহাকে আমরা বড়বাজারে গদা ময়রার দোকানে পাঠাইয়া দিতাম, ভাল খাবার কি করিয়া করে দেখিবার নিমিত্ত। গদা ময়রা আমার শ্বশুরবাড়ীর ময়রা ছিল। অক্রূর আমাদিগকে ভাল খাবার কি করিয়া করিতে হয় শিখাইয়া দিত। আমরা সমস্ত দিন ভাল খাবার করিতাম। খাবার প্রস্তুত হইলে বড় বড় রূপার থালায় খাবার সাজাইয়া বিকেলে তিনি আপিস হইতে আসিলে তাঁহার নিকট পাঠাইয়া দিতাম। তিনি দেখিয়া অতি আহ্লাদ করিতেন। কিন্তু বিশেষ কিছুই খাইতেন না ; কেবল একটু আধটু আহ্লাদ করিয়া খাইতেন।

আমার বড় সাধ হইত তাঁহাকে (শ্বশুর মহাশয়কে) রাঁধিয়া দিবার জন্য, কিন্তু তিনি খাইতেন না। কারণ, তিনি নিজেই রান্না করিয়া খাইতেন। ছেলেদের খেলানার মত তাঁর ছোট ছোট হাঁড়ী, হাতা, বেড়ী ও বোগ্‌নো ছিল। সমস্ত দিন উপোস করিয়া বিকেলে নিজে রাঁধিয়া খাইতেন। তিনি বেশী জিনিষ কিছু খাইতেন না। শুধু ভাতেভাত কিম্বা ডাল ভাতই খাইতেন। তিনি দুধ খাইতেন না, বলিতেন "গো-রস"। চা খাইবার সময় শুধু জলে চা ভিজাইয়া মিছিরি দিয়া খাইতেন।

আমার শ্বশুরেরা ছয় ভাই ছিলেন, তার মধ্যে তিন ভাইএর সংসার হইয়াছে। আর এক ভাইএর একটী মাত্র কন্যা ছিলেন, তাঁহার নাম গৌরমণি, তিনি প্রতাপ মজুমদারের * ঠাকুর মা। সেই সম্পর্কে প্রতাপ আমার নাতি। যে সব ভাইএর সন্তান হইয়াছিল, তাঁহাদের নাম, মেজ মদনমোহন সেন, ইঁহারই নামে এখন ঐ পুরাণ বাড়ীর পাশের রাস্তা হইয়াছে। সেজ, রামমোহন, ইনি প্রতাপের ঠাকুর মা'র বাবা। চতুর্থ, আমার শ্বশুর, দেওয়ান রামকমল সেন। পঞ্চম, রামধন সেন, প্রসিদ্ধ মাধব সেন † ও ঠাকুরচরণ সেনের বাবা। জয়কৃষ্ণ সেন ও

* প্রসিদ্ধ নববিধান প্রচারক ভক্তিভাজন ভাই—প্রতাপচন্দ্র মজুমদার। যোঃ।

† দেওয়ান মাধবসেন নববিধান বিশ্বাসী, বিজ্ঞ, সাধক ৺ জয়কৃষ্ণ

রাজকৃষ্ণ সেন মাধব বাবুর ছেলে। আমার শ্বশুরের ছয় ছেলে, প্রথম, হরিমোহন সেন, * জয়পুরের যদুনাথ ও নরেন্দ্রনাথ সেনের বাবা। দ্বিতীয়, আমার স্বামী প্যারীমোহন সেন। তৃতীয়, হলধর সেন, ১২ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়। চতুর্থ, শ্রীধর সেন, তিনিও সাড়ে দশ বৎসর বয়সে মারা গিয়াছেন। পঞ্চম, বংশীধর সেন, তাঁহার দুইটী মাত্র কন্যা। কনিষ্ঠ, প্রসিদ্ধ এটর্ণি মুরলীধর সেন।

আমি যে সময়ের কথা বলিতেছি তখন আমরা এ বাড়ীতে আসি নাই। তখন রাস্তার ওধারের বাড়ীতেই (যাহা এখন ঠাকুরচরণ সেনের বাড়ী) আমরা সকলে একত্রে ছিলাম। কিন্তু আমাদের সন্তান হইবার পূর্ব্বেই আমরা এ বাড়ীতে উঠিয়া আসি। এ বাড়ীতে আসার পর আমরা শ্বশুরের নিকট হইতে বেশ সৎ-শিক্ষা পাইতে আরম্ভ করিলাম। আমাদের পরিবার বৈষ্ণবধর্ম্মাবলম্বী। আমার শ্বশুর পরম বৈষ্ণব ছিলেন! যদিও তিনি অতি ধনবান এবং বিষয়ী লোক ছিলেন, কিন্তু তাঁহার

সেন মহাশয়ের পিতা ও প্রসিদ্ধ অধ্যাপক ৺মোহিতচন্দ্র সেনের পিতামহ। যোঃ।

* হরিমোহন সেন জয়পুর মহারাজার প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। জয়পুরের যাবতীয় উন্নতি ইঁহার দ্বারা সাধিত হয়। ইনি সিবিলিয়ান বি, এল্‌ গুপ্ত মহাশয়ের মাতামহ। যোঃ।

অন্তঃকরণ বিশুদ্ধ বৈরাগ্যে পূর্ণ ছিল। পূর্ব্বেই শুনিয়াছ, আহারসম্বন্ধে তিনি কিরূপ কঠোর ব্রত প্রতিপালন করিতেন। যখন বাড়ীতে থাকিতেন, পোষাক সম্বন্ধেও তাঁহার সেইরূপ ভাব ছিল। তিনি নাতিদের বড় ভাল বাসিতেন, কিন্তু ততটা কোলে করিতেন না। তাঁহার তখনকার ভাব আমি এখন বেশ বুঝিতে পারিতেছি; তিনি ঠিক নির্লিপ্তভাবে সংসার করিতেন। সংসারে থাকিতেন, কিন্তু সংসার তাঁহাকে গ্রাস করিতে পারিত না। আমি দেখিয়াছি, যখন তাঁহার এক একটী সন্তানের মৃত্যু হইত, তিনি কখনই চক্ষের জল ফেলিতেন না। শুধু হরিনামের মালা লইয়া ছাদে বসিয়া থাকিতেন। পূর্ব্বে বলিয়াছি, নূতন বাড়ীতে আসার পর পর্য্যন্ত শ্বশুর আমাদের উপদেশ দিতেন। আমরা যখন ঠাকুর ঘরে নমস্কার করিতে যাইতাম, তিনি আমাদের জিজ্ঞাসা করিতেন 'তোমরা কি বলিয়া নমস্কার কর? তোমরা কি এই বলিয়া নমস্কার কর যে, হে ঠাকুর, আমাদিগকে ধন দাও, দৌলত দাও, সুখ দাও? তোমরা কি লক্ষ্মীকে নমস্কার কর টাকা দিবেন বলিয়া? ও ষষ্ঠীর নিকট ছেলে কামনা করিয়াই কি নমস্কার কর?' আমরা বলিতাম, 'হ্যাঁ আমরা এইরূপই করি। তাহা না হইলে কি বলিয়া নমস্কার করিব, বলিয়া দিন।' তিনি উত্তরে বলিতেন, 'এই বলিয়া নমস্কার কর,—হে মধুসূদন, হে ভগবান্,

তুমি আমাদের ইহকাল পরকাল রক্ষা করো। তুমি আমাদের পাপ হইতে রক্ষা করো। বিপত্তির মধুসূদন তুমি বিপদভঞ্জন কর।' তিনি আমাদের হরিনামের মালা দিয়াছিলেন। দুই বেলা জপ কবিবার নিমিত্ত সর্ব্বদা উপদেশ দিতেন। বার মাসই তাঁহার নিকট ভাগবত পাঠ হইত। তিনি আমাদিগকে ও আমার শাশুড়ীকে ভক্তির সহিত ঐ সব ভাগবত পাঠ শুনিতে উৎসাহিত করিতেন। তিনি ঠাকুরের জন্য অনেক দেবোত্তর, ১০,০০০ টাকা এবং বিস্তর সোণা রূপার বাসন রাখিয়া গিয়াছিলেন। আমরা যখনই কোন ব্রত ইত্যাদি গ্রহণ করিতে চাহিতাম তিনি আহ্লাদের সহিত স্বীকৃত হইতেন ও আমাদিগকে উৎসাহিত করিতেন।

দ্বিতীয় দিবস—৬ই জুন, ১৮৯২।

আমার শ্বশুর আমায় বড় ভাল বাসিতেন। আমার বিবাহের পর আমি যখন এক বৎসর বাপের বাড়ী ছিলাম, তিনি প্রত্যেক রবিবারে আমাকে দেখিতে যাইতেন। যখনই যাইতেন আমার জন্য টাকা ও ট্যাঁকশাল হইতে নূতন রাঙা পয়সা লইয়া যাইতেন। তিনি ঠিক বাপের মতন আমাদের ভাল বাসিতেন। প্রত্যেক দিন

আমিও বসিয়া বসিয়া কাঁদিতাম। সাহেব আমার স্বামীকে অতি ভাল বাসিতেন, আমার শ্বশুরকে বলিতেন, "আপনার ছেলেকে ঘরে বসাইয়া রাখিবেন না, ফের কর্ম্ম করিতে দিন, তবেই ধার শোধ যাবে।" কিন্তু আমার শ্বশুর দিতেন না। তার পর আমার শ্বশুরের মৃত্যুর ২।৩ বৎসর পরে যখন আমার স্বামী ট্যাঁকশালের দেওয়ান হইলেন, সেই মাহিয়ানার টাকা হইতে তিনি ক্রমে ব্যেগ্ সাহেবের হাউসের ধার শোধ দিতে লাগিলেন। পূর্ব্বে বলিয়াছি, যখন আমার স্বামী হাউসে কর্ম্ম করিতেন তিনি অনেক টাকা উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। বাক্স পূর্ণ করিয়া টাকা ও কোম্পানির কাগজ বাড়ী আনিতেন। আমি কিন্তু কখনও টাকা চাহিতাম না। পাছে তিনি মনে করেন, আমি গরিবের মেয়ে, কখনও টাকা দেখি নাই, তাই টাকা চাহিতেছি। এই ভয়ে আমার টাকা লইতে ইচ্ছা হইত না। তিনি থলে থলে নূতন পয়সা, সিকি, দুয়ানি ইত্যাদি আনিয়া আমার হাতে দিতেন, এবং বলিতেন এই সব তোমার ইচ্ছা মতন সমস্ত লোক জনকে হাতে করিয়া বিলাইয়া দাও। আমি নিজে বিলাইতাম না, লজ্জা করিত। তাহাতে তিনি বলিতেন, 'এখন বিলাইতেছ না বটে, শেষে পাবে না, কেউ এমন করিয়া তোমায় দেবে না।' তিনি সব সময় আমায় উপদেশ দিতেন। বলিতেন, 'যাতে

ভাল হও তার জন্য সর্ব্বদা চেষ্টা করিবে। কখনও খুব চেঁচিয়ে হাসিও না, কাহারও সঙ্গে চেঁচিয়ে কথা কহিও না', ইত্যাদি। তিনি কখনও বেআব্রু ভাল বাসিতেন না, এবং যাহাতে সর্ব্বদা আব্রুতে থাকি সেই জন্য চেষ্টা করিতে উপদেশ দিতেন। তিনি বলিতেন, 'যখন কোথাও যাই, তাহারা যখন তোমার সুখ্যাৎ করে শুনে বড় আহ্লাদ হয়।'

পূর্ব্বে বলিয়াছি, তখনকার মেয়েদের আজ কালের মেয়েদের মতন লেখা পড়া শিখিবার এমন সুবিধা ছিল না, শিখিতে চাহিতও না। কিন্তু আমার স্বামীর মত এই বিষয়ে সকল অপেক্ষা উন্নত ছিল। তিনি একান্ত ইচ্ছা করিতেন যে, আমি লেখা পড়া করি। অন্যত্র শিখিবার কোনও সুবিধা ছিল না বলিয়া তিনি নিজেই আমায় রাত্রিতে পড়াইতেন। তাঁহার হাতের অক্ষর অত্যন্ত সুন্দর ছিল, তিনি নিজে লিখিয়া আমায় সেই রকম করিয়া লিখিতে বলিতেন। আমিও চেষ্টা করিতাম। হাতের লেখাসম্বন্ধে কেশব তাঁহার পিতার গুণ অনেকটা পাইয়াছিলেন। অনেক দিন লিখি নাই বলিয়া আমি লিখিতে পারি না, কিন্তু পড়িতে পারি। ধরিতে গেলে ব্যেগ্ সাহেবের হাউস ফেল্ হওয়া হইতে আরম্ভ হইয়া আমার মেজ মেয়ে ফুলেশ্বরী ও সেজ মেয়ে চুণীর সময়েতেই আমাদের অত্যন্ত আর্থিক এবং মানসিক

কষ্ট হয়। আমার সেজ মেয়ে চুণী যখন নয় মাসের তখন আমার শ্বশুরের কাল হয়। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, আমাদের পরিবার পরম বৈষ্ণব-ধর্ম্মাবলম্বী ছিল, সুতরাং পরিবারের চির নিয়মানুসারে আমার শ্বশুরের সমাধি বৃন্দাবনেই হইয়াছিল। আমার চতুর্থ মেয়ে পান্না হইবার কিছুদিন পূর্ব্বে আমার স্বামীর পুনরায় ট্যাঁকশালে কর্ম্ম হয়। এই সময় হইতে পুনরায় আমরা কিছু সুখের দেখা পাইয়াছিলাম। আমার ছোট ছেলে কৃষ্ণবিহারীর সময় আমাদের অবস্থা আবার খুব ভাল হইয়াছিল। ভেবেছিলাম, বুঝি পূর্ব্বের সুখ আবার হইল। এক অগ্রহায়ণে আমার কৃষ্ণবিহারীর জন্ম হয়, ফিরে কার্ত্তিকে আমার সেই সুখের জাহাজ ডুবিয়া যায়; আবার আমরা দুঃখের সাগরে ভাসিলাম। এত বড় সাগর—যে তাহার আর কূল কিনারা পাইলাম না। আমার স্বামী কখনও কোন দিন বিদেশে বাহির হইতেন না। কি কুক্ষণে সেইবার তাঁহার বৈদ্যনাথে বেড়াইতে যাইবার ইচ্ছা হইল। বলিলেন, 'দাদার সঙ্গে আমিও বৈদ্যনাথে যাব।' পূজার ১২ দিনের ছুটীতে বেড়াইয়া আসিবেন, সমস্ত ঠিক হইল। পাল্কীর ডাক বসিল। দুই ভা'য়েতে ডাকে রওনা হইলেন। যাইবার পূর্ব্বে যত ভারি ভারি দামের শাল ছিল তাহা চারি ভাগ করিয়া

সিন্ধুকে রাখিয়া দিলেন। তাঁহারা পঞ্চমীর দিন বাহির হইলেন। আমরাও এদিকে নৌকা করিয়া গৌরিভায় যাইবার জন্য কলিকাতা হইতে যাত্রা করিলাম। আমাদের বজ্‌রার সঙ্গে তাহাদের পাল্কীর পুনরায় চুঁচুঁড়ার ঘাটে দেখা হইল। তিনি পাল্কী হইতে নামিয়া বজ্‌রায় আসিলেন। এসে ১১ মাসের কৃষ্ণবিহারীকে কোলে করিয়া পাল্কীতে তুলিয়া লইলেন। পাল্কী একটু দূরে গেলে আবার বেহারা কৃষ্ণবিহারীকে আনিয়া আমার নিকট দিয়া গেল। আমরা বাড়ী গেলাম, খুব ধূমধামের সহিত পূজা হইয়া গেল। দশমীর পরদিন আমি আমার মামার বাড়ী ত্রিবেণীতে বেড়াইতে গেলাম। সেইখানে খুব আমোদ আহ্লাদ হইল। সঙ্গে অনেক টাকা ও লোক জন লইয়াছিলাম, এবং গ্রামের সকলকেই টাকা দিয়া আশীর্ব্বাদ লইলাম। কিন্তু, হায়! সেই আশীর্ব্বাদ মিথ্যা হইল। এখন মনে হয়, যেন সে আশীর্ব্বাদ নয়, গালাগালি। এক দিন পরেই গৌরিভায় চলিয়া আসি।

অনেক দিন হইতে আমার সাধ ছিল, একবার ত্রিবেণীতে যাই। তাহা লইয়া সব সময় আমার স্বামীকে এত বিরক্ত করিতাম যে, শেষে তিনি বলিতেন, 'তোমায় আমি অনেক গুলি কড়ি আনিয়া গুণিতে দিব, তাহা হইলে তুমি ও কথা ভুলিয়া যাইবে।' শেষে তিনি আমার এই সাধ পূর্ণ করিলেন। ত্রিবেণীতে খরচ করিবার

জন্য যথেষ্ট টাকা দিলেন, এবং আমার ননদ ও অন্যান্য লোকজনকে বলিয়া গেলেন, আমার সঙ্গে যাইবার জন্য।

আমরা ত্রয়োদশীর দিন গৌরিভা হইতে কলিকাতায় আসিলাম। আমার স্বামীও কোজাগর পূর্ণিমার পরদিন কলিকাতায় আসিলেন। আসিবার সময় পাটুলিতে নামিয়া আহার করিলেন। সেই খানেই তাঁহার ভয়ানক জ্বর, হইল। ৩।৪ দিনের সেই জ্বর লইয়া তিনি কলিকাতায় আসিলেন, কবিরাজ রামমোহন সেনকে ডাকান হইল। কিন্তু তিনি প্রথম দিন ঔষধের ব্যবস্থা করিলেন না। তার পরদিন ঔষধ দিলেন এবং বলিলেন, 'সামান্য জ্বর, শীঘ্রই সারিয়া যাইবে।' তিনি ব্যারামের সময় মোচা ও পল্‌তাভাজা ভাল বাসিতেন। সেই দিন তাহাই খাইতে চাহিলেন। এই দুই জিনিষ প্রস্তুত করিয়া আনিয়াছি, আর দেখি কিনা, তিনি সেই তেতালা থেকে দোতলার বড় ঘরে আসিয়া পড়িয়াছেন ;—যে ঘরে এখন কৃষ্ণবিহারী বসেন। যে জ্বর একটু কমিয়াছিল তাহা গঙ্গার পূরন্ত জোয়ারের মত বাড়িয়া গিয়াছে। তিনি ছট্‌ফট্‌ করিতেছেন, আর বলিতেছেন, 'আমি যাই, আমায় ধর।' সর্ব্বনাশ! আমার কান্না আসিল, কাঁদিয়া ফেলিলাম। শাশুড়ীকে খবর দিলাম, তিনি দৌড়িয়া আসিয়া কোলে করিয়া বসিলেন।"

তৃতীয় দিবস—১২ই জুন, ১৮৯২।

আমার ভাশুর বাড়ী ছিলেন না। তিনি আমার শ্বশুরের বন্ধু রাজা রাধাকান্ত দেবের * মোকদ্দমায় সাহায্য করিতে হুগলিতে গিয়াছিলেন। আমার জ্যেঠ শ্বশুরের ছেলে গোবিন্দবাবুকে আমার শাশুড়ী ডাকাইয়া পাঠাইলেন। তিনি প্রসিদ্ধ (ক্রোড়পতি) গোবিন্দবাবু, ইঁহার জমীদারী চট্টগ্রামেও ছিল। তিনি আসিয়া প্রথমে দেশী ডাক্তার কবিরাজের দ্বারা চিকিৎসা করাইলেন, কিন্তু ব্যারাম আরও বৃদ্ধি পাইয়া গেল। সেই দিন আমার ভাশুর আসিয়া কেল্লা হইতে চারি জন সাহেব ডাক্তার আনাইলেন। সাহেবেরা চিকিৎসা করিলেন না, অনেক আপ্‌শোষ করিয়া চলিয়া গেলেন। আমার ভাশুর আসিবার পূর্ব্বের দিন রাত্রিতে যখন তাঁহার ব্যামো বাড়িয়া গিয়াছিল, তিনি আমার দেওর গোবিন্দবাবুকে বলিয়াছিলেন, "যখন তোমরা বুঝিবে আমার ব্যামো খারাপ হইয়াছে, তখন আমার পরিবারকে আমার কাছে আনিয়া দিও।" তাঁহার এই সব কথা শুনিয়া আমার মন কেমন করিতেছিল, তাই আমার বড় ছেলে নবীনের দ্বারা তাঁহাকে বলিলাম, যেন তিনি ঐরূপ

* শোভাবাজারের বিখ্যাত রাজা সার্ রাধাকান্ত দেব বাহাদুর দেওয়ান রামকমল সেনের বিশেষ বন্ধু ছিলেন। যোঃ—

কথা না বলেন। নবীন যখন বলিলেন, "বাবা, আপনি এমন কথা বলিবেন না, মার ভারি কষ্ট হইতেছে।" তিনি তখন হইতেই কথা বন্ধ করিলেন, আর কথা কহিলেন না। তার পর দিন সকাল বেলা গোবিন্দবাবু আমায় একবার সেই ঘরে ডাকিয়া লইয়া গেলেন। তখন যদিও বেশ জ্ঞান ছিল, কিন্তু বিষয় কিছুই ছিল না। আমি তাঁহার সেই অবস্থা দেখিয়া কাঁদিয়া আছ্‌ড়াইয়া পড়িলাম। আমার এই অবস্থা দেখিয়া তিনি একবারে অজ্ঞান হইয়া গেলেন।

সকলে ছুটিয়া আসিয়া আমাকে বকিতে লাগিলেন। আমি একদিকে রহিলাম। তাঁহার মুখে জল ইত্যাদি দিলে ক্রমে পুনরায় তাঁর জ্ঞান হইল। আমি সমস্ত দিনই তাঁহার শিয়রে বসিয়া রহিলাম। তিনি এক এক বার আমার দিকে মুখ তুলিয়া দেখিতে লাগিলেন। কিন্তু একটীও কথা কহিলেন না, পাছে আমার সেই রকম কষ্ট হয়। তখন আমার বড় ছেলে নবীনের বয়স ১৩।১৪ বৎসর হইবে। নবীনকে ডাকিয়া তিনি বলিলেন,—"বাবা, তুমি আমাকে বাঁচাও, তাহা হইলে তোমাদের কত ভাল হইবে।" কিছুক্ষণ পরে যখন ট্যাঁকশালের সাহেব তাঁহাকে দেখিতে আসিলেন, তিনি নবীনের ও সাহেবের হাত ধরিয়া বলিলেন, "সাহেব, আমার এই ছেলে আর তুমি রইলে—" ইহার

বেশী আর কিছু বলিতে পারিলেন না। সাহেব তাঁহাকে বলিলেন, তিনি যেন ছেলেদের জন্য না ভাবেন। সাহেবের পূর্ব্বে মতিশীল * তাঁহাকে দেখিতে আসিয়াছিলেন। আমার শ্বশুর মৃত্যুর পূর্ব্বে যে উইল করিয়া যান তাহাতে মতিশীল, রাজা রাধাকান্ত দেব, দুই জন সাহেব, আর পিসতুতো ভাশুর, কর্ত্তা ছিলেন। মতিশীল তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার মনে কি আছে বল।" তিনি বলিলেন, "এখন বলিব না, দাদা আসিলে বলিব।" মতিশীল বলিলেন, "তুমি দাদার এত প্রিয় যে এই অবস্থাতেও দাদা না আসিলে কিছুই বলিবে না।" এই বলিয়া দুঃখিত হইয়া উঠিয়া গেলেন। তার পর যখন আমার ভাশুর আসিলেন, তখন তাঁহাকে ডাকিয়া বলিলেন, "দাদা, তুমি আমার কাছে বসো; তোমার বুদ্ধি ঠিক আছে, আমার বুদ্ধি ঠিক নাই।" ভাশুর বলিলেন, "ওসব কথা এখন নয়, পরে হইবে।" এই বলিয়া উঠিয়া গেলেন। তার পর আমার ননদ বিন্দুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বিন্দু, এখানে কে কে আছেন?" তিনি বলিলেন, "আমি ও মেজ বৌ।" বোধ হয় অজ্ঞান ভাবেই পুনরায় জিজ্ঞাসা

* ইনিই কোলুটোলার শীলপরিবারের প্রতিষ্ঠাতা প্রসিদ্ধ মতিশীল। ইনিও দেওয়ান রামকমল সেনের বিশেষ বন্ধু ছিলেন। যোঃ—

করিলেন, "কোন্ মেজ বৌ?" ছোট ঠাকুর ঝি (বিন্দু) বলিলেন, "আমাদের মেজ বৌ, নবীনের মা।" ইহা শুনিয়া বিন্দুকে বলিলেন, "তোমরা এখানে থাক।" তার পর আমার পিঠে হাত দিয়া বলিলেন, "তুমি আমার কাছ থেকে যেও না। তোমাকে আমি বড় ভাল বাসিতাম, এখন তুমিই বা কোথায় রইলে, আর আমিই বা কোথায় চলিলাম।" এই তাঁর শেষ কথা, তার একটু খানিক্ পরেই তিনি গেলেন।

আমি তাঁহাকে যতদূর বুঝিতে পারিয়াছি, তাহাতে আমার স্বামীর এই কয়টী গুণ বিশেষ লক্ষ্য করিয়াছিলাম। প্রথম, তাঁহার ধর্ম্মে অতিশয় মন ছিল। প্রায় চারিটার সময় উঠিয়া হরিনাম করিতেন ও পূজা ইত্যাদি করিতেন, তার পর ভোরে স্নান করিয়া সমস্ত গায়ে হরিনামের ছাপ পরিতেন ও কপালে তিলক কাটিয়া নামাবলী গায়ে দিতেন। আপিসে যাইবার সময় নামের ছাপের উপরেই পোষাক পরিতেন কিন্তু কপালের তিলক ধুইয়া ফেলিতেন। তিনি দেখিতেও অতি সুন্দর ছিলেন। যখন চেলির কাপড় পরিয়া মালা ও সর্ব্বাঙ্গে ছাপ পরিয়া বাহির হইতেন, তখন সকলেই বলিতেন, "গোঁসাই যাইতেছেন।" তিনি পাখী বড় ভাল বাসিতেন, যখনই বাহির হইতেন, তাঁহার সঙ্গে সেই বড় বড় খাঁচায় করিয়া পাখীদের লইয়া যাইতে

হইত। তাঁহার দানশক্তি অত্যন্ত অধিক ছিল, যখন দেশে যাইতেন, সঙ্গে বাক্স ভরিয়া টাকা ও পয়সা লইয়া যাইতেন, এবং তাহা সকলকে বিলাইয়া শুধু বাক্স লইয়া চলিয়া আসিতেন। পূজার সময় যখন যাত্রা ইত্যাদি হইত তখনও বাক্স শুদ্ধ টাকা লইয়া সভায় বসিতেন, দিতে দিতে যখন সমস্ত টাকা ফুরাইয়া যাইত তখন উঠিয়া আসিতেন। তিনি রাগী ছিলেন না। চাকর চাকরাণীদের কিম্বা ভাই ভগ্নী কাহাকেও কখনও কিছু বলিতেন না। ছেলে মেয়েদের প্রতি কখনও রাগ করিতেন না। তিনি বেশী কথা কহিতেন না, বড় কম কথা বলিতেন। গুরুর প্রতি তাঁর অচলা ভক্তি ছিল। তিনি হিন্দুকলেজে পরীক্ষা দিয়া মেডেল পাইয়াছিলেন। ইংরাজী, বাঙ্গলা, সংস্কৃত ও ফার্শিতে তিনি অতি পণ্ডিত ছিলেন। গান ও বাজনাতে তাঁহার খুব দখল ছিল। হারমোনিয়ম্, এস্‌রাজ, পাখোয়াজ ইত্যাদি অতি সুন্দর বাজাইতেন। অধিক সময়, বিশেষতঃ কুঠি হইতে আসিয়া সেতার লইয়া থাকিতেন। তিনি অতি সুন্দর সুন্দর ছবি আঁকিতে পারিতেন। তিনি কুস্তি দেখিতে বড় ভাল বাসিতেন। তারি জন্য সর্ব্বদা দুই জন পালোয়ান সঙ্গে রাখিতেন। তাঁকে চাকর খান্‌সামারা পর্য্যন্ত ভালবাসিত। তাঁহার এক বিশ্বাসী খান্‌সামা ছিল, সে তাঁহার মৃত্যুর পর কাগজপত্রের বাক্স

এবং তিনি সর্ব্বদা যে হীরার আংটি ব্যবহার করিতেন তাহা লুকাইয়া রাখিয়াছিল, পাছে ঐ সব জিনিষ কেহ আমাদের হাত হইতে লইয়া যায়। আংটিটী এক দেওয়ালের গায়ে লুকাইয়া রাখিয়াছিল। শেষে যাইবার সময় সে নবীনকে সমস্ত বুঝাইয়া দিয়া গিয়াছিল।

আমার বিধবাবস্থা বা দুঃখের কথা।

স্বামীর মৃত্যুর দিন পনের পরেই আমার সেজ দেবর প্রথম আমার উপর অত্যাচার আরম্ভ করেন। তেতালার ঘরে যে বড় খাটে আমার স্বামী শুইতেন, ঘরের কপাট ভাঙ্গিয়া সে খাট খানি আমার সেজ দেবর লইয়া গেলেন, আমি কাঁদিলাম। জিনিষের লোভে যে আমি কাঁদিলাম তাহা নয়, কাঁদিলাম এই জন্য যে, তিনি যাইতে না যাইতেই ইঁহারা আমার সঙ্গে এইরূপ ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিলেন। আমার শাশুড়ী মাথা খুঁড়িতে লাগিলেন, তাহাতে আমার বড় ভয় ও দুঃখ হইল। ভাবিলাম, আমি কেন কাঁদিলাম। তাতেই ত তিনি এই কষ্ট পাইলেন। মনকে বলিলাম, তাঁহাদের ভাইয়ের জিনিষ তাঁহারা লইবেন, আমি কেন দুঃখ করিব? আমি ত আর বাপের বাটী হইতে আনি নাই। এই সব দেখিয়া শুনিয়া আমার ক্রমে ক্রমে এক ভয় হইল। আমি সব

সময় আমার ছেলেমেয়েদের লইয়া এক ঘরে দরজা দিয়া পড়িয়া থাকিতাম। ভয়ে ভয়ে ভাবিতাম, যদি ইঁহারা আমাকে ছেলে মেয়ে শুদ্ধ তাড়াইয়া দেন, তবে আমি কোথায় যাইব? এইরূপে আমার দিন যাইতে লাগিল। তিনি বৈদ্যনাথে যাইবার পূর্ব্বে ভাগের যে সব শাল সিন্দুকে চাবি দিয়া তাঁহার মার নিকট রাখিয়া গিয়াছিলেন, সেই সিন্দুক খুলিয়া আমার সেজ দেবর সমস্ত শাল বাহির করিয়া লইয়া গেলেন। ভাশুর * বলিলেন, "বংশী ওসব শাল নিয়েছে নিক্, আমি তোদের নূতন শাল কিনিয়া দিব।" আমার স্বামী নিজে যে দুই খানি শাল ব্যবহার করিতেন, তাঁর চিহ্নস্বরূপ আমি সেই দুই খানি শাল চাহিয়া পাঠাইলাম। তাহারা এক খানি মাত্র দিলেন। ইহার পর আর আমি কিছুই বলিলাম না। কোনও কথাতেই থাকিতাম না। স্বামী যাওয়ার এক বৎসর পর আমার বড় মেয়েটীর মৃত্যু হয়। আমার এই মেয়েটী বড় ভাল ছিল; তাহার শোকে আমি একেবারে অধীর হইয়া পড়িলাম। এই শোকের কিছু-

* হরিমোহন সেন তাঁহার পিতৃহীন ভ্রাতুষ্পুত্রদের নিজের ছেলের অপেক্ষা অধিক ভালবাসিতেন ও অতি যত্নে মানুষ করিয়াছিলেন। হরিমোহন সেনের যত্নে ছোট ছেলে কৃষ্ণবিহারী একদিনও বুঝিতে পারেন নাই যে তিনি পিতৃহীন। কৃষ্ণবিহারী সেনও চিরকাল তাঁহাকে পিতার ন্যায় ভক্তি করিতেন। লেঃ—

দিন পরেই আমার শাশুড়ীর মৃত্যু হয়। সেই বৎসরেই আমার প্রিয়তমা ননদ বিন্দুরও মৃত্যু হয়। এই উপর্য্যু-পরি শোকে আমি আর স্থির থাকিতে পারিলাম না। শ্রীক্ষেত্রে যাত্রা করিলাম। পাগলের মত হইয়া বাহির হইলাম।

মনে করিলাম, আর জীবন রাখিব না। আমার বড় ছেলে নবীন বলিলেন, "মা এই সময় আমাদের বিষয় ভাগ হইবে, তুমি কোথাও যাইও না।" আমি বলিলাম, "তোদের দুর্ঘটনাই হোক্ আর বিষয়ই যাক্, আমি থাকিব না।" আমার কৃষ্ণবিহারী তখন তিন বৎসরের। আমি একখানি কাপড় হাতে করিয়া বলিলাম, "চল্লাম, আর তোরা যদি আমাকে যাইতে না দিস্, আমি কিছু চাইনে, এই কাপড় হাতে করে হেঁটেই চলিয়া যাইব!" আমি সব মায়া কাটাইবার জন্য ঠাকুরের কাছে এই ভিক্ষা চাইলাম যে, "হে ঠাকুর, তুমি আমায় শুভবুদ্ধি দাও আর যেন এখানে ফিরে আস্‌তে না হয়।" আমি নিতান্ত যখন যাইতে চাইলাম তখন তাঁহারা সব ঠিক করিয়া দিলেন, সঙ্গে লোকজন দিলেন এবং পাল্কীর ডাক বসিল। আমার ভাশুর বাপের বাড়ী থেকে আমার ভাজকে কৃষ্ণবিহারীর জন্য আনাইয়া লইলেন।

চতুর্থ দিবস—২২শে জুন, ১৮৯২।

আমি শ্রীক্ষেত্রে যাত্রা করিলাম। পথে সকলের চিঠি আসে আমার আর চিঠি যায় না, বড়ই কান্না পাইত। সবাই বলিতেন, "তুমি যদি এত কাঁদ, তবে শেষে ঠাকুর দেখিতে পাইবে না।" আমি ভাবিতাম, ঠাকুর কি এতই নির্দ্দয় যে আমার এত শোকেতেও আমায় দেখা দিবেন না। আমার মতন অভাগী কি আর পৃথিবীতে আছে? এতেও কি তিনি দয়া করিয়া আমায় দেখা দিবেন না? পথে আমার বড় ব্যামো হইয়াছিল। সে দেশের লোকেরা দইএর সঙ্গে ধুতুঁরার বীচি মিশাইয়া দিত এবং পাত্‌লা চুণ মিশাইয়া দিত। আমি সেই দই খাইয়া প্রায় চব্বিশ ঘণ্টা একেবারে অজ্ঞান হইয়াছিলাম। মনে হইল. কোথায় আসিয়া মৃত্যু হইল, ঠাকুরকে দেখিতে পাইলাম না। অন্যান্য যাত্রীরা হরিনাম করিয়া জোরে যাত্রা করিতে লাগিল। আমার দারোয়ান আমায় বলিল, "মা, আপনি কি একলা থাকিবেন?"

পঞ্চম দিবস—২৭শে জুন, ১৮৯২।

আমি অজ্ঞানাবস্থায় সমস্ত রাত্রি উঠানে ছিলাম। ভোরে চেতনা হইলে সব যাত্রীদের সঙ্গে আমিও "জয়

জগন্নাথ” বলিয়া উঠিলাম। আমি মৃত্যু আশঙ্কা করিয়া বাড়ী ফিরিতেছিলাম। ভাবিলাম, আমার কোলের ছেলে কৃষ্ণবিহারীকে ফেলিয়া আসিয়াছি। তাহার কথা মনে করিয়া সব সময়ই কাঁদিতাম, আমি যাত্রা করিবার সময় সে বড় কাঁদিয়াছিল, ইহা মনে করিয়া সকল পথই কাঁদিতে কাঁদিতে গিয়াছিলাম। আমি তাহাকে এইরূপে প্রায়ই ফেলিয়া যাইতাম বলিয়া তাহার বড় কষ্ট হইত। আমায় বলিত, “তুমি আমায় অত ফেলিয়া যাও কেন? তোমার কি আমার উপর মায়া হয় না?” আর একদিন বলিয়াছিল, “আমার মত দুঃখ কাহারও পৃথিবীতে নাই।” আমি বলিলাম, “কিসের দুঃখ তোর বল্।” কৃষ্ণবিহারী বলিল, “না আমি বলিব না, কখনও বলিব না।” আমি বলিলাম, “বল্ লক্ষ্মী বল্, আমি তোমায় টাকা দেবো, খেলানা দেবো, বল্ তোর কিসের দুঃখ?” কৃষ্ণবিহারী তখন বলিল, “বাবুর বাবা (আমার ভাশুর হরিমোহন সেনের ছেলে উপেন্দ্রনাথ, তাঁকে কৃষ্ণবিহারী “বাবু” বলিত আর উপেনও কৃষ্ণবিহারীকে “বাবু” বলিত।) গঙ্গায় নাইতে যান আর ফিরিয়া আসেন; কৈ আমার বাবা ত আর ফিরিয়া আসিলেন না।” আমি উত্তর দিতে পারিলাম না; আমার বড় মেয়ে সেখানে ছিল সে কাঁদিয়া ফেলিল। আমার ভাশুর এই

কথা আমার জার মুখে শুনিয়া আসিয়া কৃষ্ণবিহারীকে কোলে করিলেন এবং বলিলেন, "তোর কিসের দুঃখ, তুই যখন যা' চাইবি তাই দেবো, তোর বাবা নৌকা করিয়া বেড়াইতে গেছেন।" এই সব কারণে কোলের ছেলের জন্য আমার বড়ই মন কেমন করিত। আমি বাড়ী ফিরিয়া যাইতে চাহিলে, আমার সঙ্গে যে দারোয়ান গিয়াছিল সে বলিল, "মা, বাড়ী ফিরে যা'বেন কেন? বাড়ী ফিরিলেও রাস্তাতে মৃত্যু হইবে, আর জগন্নাথ গেলেও রাস্তাতে মৃত্যু হইবে, কাজ কি? জগন্নাথই চলুন, আপনার লোকের সঙ্গে গেলে ইঁহা-দেরই নিকট মৃত্যু হইবে, আর আমাদের নিকট মৃত্যু হইলে কি হইবে?" তখন আমি বলিলাম, "আচ্ছা যাইব, আমায় পাল্কীতে তোল।" তখন আমি পাল্কীতে উঠিলাম কিন্তু দু'দিগের দরজা খোলা রাখিলাম, আর হনুমান্ সিং দারোয়ান পাল্কীর দরজা ধরিয়া বাতাস করিতে করিতে দৌড়াইয়া চলিল। আমরা বাণেশ্বর-বন্ধে পঁহুছিলাম, শেষ রাত্রির হাওয়া লেগে আমার ক্রমে ক্রমে জ্ঞান হইতে লাগিল। তারপর দিন স্নান করিয়া সমস্ত দিন ঘুমাইলাম, কিছুই খাইলাম না। কিন্তু অন্যান্য সকলের ভেদবমি হইতে লাগিল। শুধু দুই একজন, যাহারা পূর্ব্বদিন সেই বিষাক্ত দই খায় নাই, তাহারা ভাল রহিল। গোবিন্দ বাবুর ভগিনী (প্রতাপ

মজুমদারের শ্বাশুড়ীর মা) আর একজন বৈষ্ণের মেয়েরই অত্যন্ত অধিক হইল। এমন কি, তাঁহাদিগকে সমস্ত রাত্রি গাছ তলায় রাখিতে হইয়াছিল। তারপর দিন আমরা সকলে নিজ নিজ পাল্কীতে করিয়া সেই রোগের অবস্থায় পুনরায় যাত্রা করিলাম। নূতন আড্ডায় যখন পঁহুছিলাম, তখন জানিতে পারিলাম যে, সেই বৈষ্ণের মেয়েটীকে রাস্তার ধারে ফেলিয়া আসা হইয়াছে। তখন আমার খুড়শ্বাশুড়ী (মাধব বাবু ও ঠাকুরচরণ বাবুর মাতা) তাঁর চাকর কেষ্টাকে পাঠাইয়া দিলেন, সে যাইয়া দেখিল, সেই বউটী গাছ তলায় পড়িয়া রহিয়াছে। কেষ্টা তাহাকে ডুলি করিয়া লইয়া আসিল।

এইরূপে চলিতে লাগিলাম। রোজ রাত্রি চারিটার সময় সমস্ত যাত্রী দল বাঁধিয়া রওনা হইতাম, বেলা দশটা পর্য্যন্ত চলিয়া এক জায়গায় আড্ডা লইতাম। সেখানে সমস্ত দিন ও সমস্ত রাত্রি থাকিতে হইত। এইরূপে দলবদ্ধ হইয়া না গেলে যাত্রীদের ডাকাতে মেরে নিত। যদিও আমাদের সঙ্গে তিন চারি জন দারোয়ান, সরকার, চাকর ও চাকরাণী এবং প্রত্যেক পাল্কীতে আটজন করিয়া ১০।১১ খানি পাল্কীর বেহারা ইত্যাদিতে অনেক লোক ছিল, তবুও আমরা অন্য যাত্রীদের সঙ্গে দল বাঁধিয়া যাইতাম। আমাদের সঙ্গে রাধানাথ শেঠ

(বসাক) সহযাত্রী ছিলেন। ইঁহার সঙ্গে বিস্তর লোক ও জিনিষ ছিল। অনেক ঔষধও ছিল, সেই ঔষধের দ্বারা আমাদের লোকের ভেদবমি ব্যমোতে অনেক উপকার হইয়াছিল।

৬ষ্ঠ দিবস—২রা নবেম্বর, ১৮৯২।

শ্রীক্ষেত্রে আমরা কুড়ি দিন ছিলাম, দণ্ডভাঙ্গা নদীতে স্নান করিয়া পুরাতন কাপড় ত্যাগ করিলাম। শ্রীগৌরাঙ্গ এই নদীতে দণ্ড ভাসাইয়া প্রকৃত সন্ন্যাসী হইয়াছিলেন। স্নানের পর তুলসীচূঁড়োতে আসিয়া ধ্বজা দর্শন করিলাম। এই স্থান হইতে আমরা আর পাল্কীতে উঠিলাম না, হাঁটিয়াই চলিলাম। এই স্থানে আমাদের জন্য দুই ভাঁড় প্রসাদ আসিল। আমরা সকলে এক সঙ্গে খাইতে বসিলাম। আমাদের দেশের এক কৈবর্ত্তের মেয়ে (চাকরের বোন্) সুখী দৌড়ে এসে আমার সঙ্গে এক পাতে বসিয়া গেল। আমার মনে কোনও দ্বিধা ভাব হইল না। আমাকে কেহ কেহ বকিতে লাগিলেন। আমাদের সঙ্গে বাড়ীর ছেলেদের এক গুরু গিয়াছিলেন। তিনি প্রথমে খেলেন না, কিন্তু পাছে জগন্নাথ দেখিতে না পান এই ভয়ে, সকলে খাইয়া গেলে শেষে

পাতের উচ্ছিষ্ট খাইতে লাগিলেন। তুলসীতলা হইতে জগন্নাথ দর্শন করিতে চলিলাম। মন্দিরে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে প্রাণে যে কি এক অপূর্ব্ব আহ্লাদ হইয়াছিল, বলিতে পারি না। সকলে ছুটিতে লাগিলাম, পড়িয়া যাইবার ভয় মনে ছিল না। কিন্তু মন্দিরে ঢুকিয়া মনে ভয় হইল, যদি ঠাকুর দেখিতে না পাই! আমি সমস্ত রাস্তা ছেলেদের জন্য কাঁদিতে কাঁদিতে আসিয়াছি। ঠাকুরকে বলিলাম, "ঠাকুর, আমি বড় গরিব, সমস্ত রাস্তা কাঁদিতে কাঁদিতে আসিয়াছি, আমায় দেখা দিও।" কিন্তু এখন বোধ হয় আর সেই রকম কষ্ট হয় না, কারণ আমার মন এখন আর সেই রকম মায়ায় মুগ্ধ নয়। আর এখন বুঝি, যদি তিনি দুঃখীকে না দেখা দিবেন, তবে তিনি কিসের ঠাকুর? আমি একটু পেছনে ছিলাম বলিয়া প্রথমে বলরামের মুখ দেখিতে পাইলাম। শেষে সম্মুখে যখন গেলাম, তিন ঠাকুরই দেখিলাম। আমরা সমস্ত বেড়াইয়া ক্রমে ক্রমে দর্শন করিতে লাগিলাম। রথ-যাত্রার কিছু দিন পূর্ব্বে "আটকে" বান্ধিলাম। শিবু পাণ্ডা আমার নিকট হইতে সমস্ত লিখিয়া লইল। রাজার সরকারে ১২৫ টাকা জমা দিতে হইল, ইহার সুদ হইতে প্রতিদিন একজন করিয়া ব্রাহ্মণ ভোজন হইবে।

ধর্ম্মমত।

এই পর্য্যন্ত বাড়ীর ছেলেদের কোন খবর না পাইয়া বড় কষ্ট এবং ভাবনা হইয়াছিল। কিন্তু সেই দিনই চিঠি পাইলাম। রথ-যাত্রার জন্য আমরা অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। আমরা রথের পরদিন, রথের দড়ি ধরিলাম। রথের দড়ি মাথায় দিয়া যাত্রীদের রাস্তার উপর শুইতে হয়। আমরাও অল্পক্ষণের জন্য শুইলাম। আমি মনে করিলাম আমার অতি পুণ্য হইল। কিন্তু এখন হইলে ঠিক সে রকম ভাবিতাম না। তখন একটু ছেলেমী ছিল। এখনও আমি তীর্থ করি, কিন্তু ঠিক পুণ্য হইবে বলিয়া করি না। তীর্থ দেখা ভাল কাজ বেশ বুঝি। আমি এখন ভালবাসার উপর তীর্থ দর্শন করি। যেমন ছেলেপুলে এবং আপনার লোকদের ভালবাসি, সেইরূপ তীর্থ ব্রত ইত্যাদি বাহিরের কর্ম্ম হইলেও আমি ভালবাসি। কিন্তু এই সব করিলেই যে আমার পরিত্রাণ হইবে তাহা আমি বিশ্বাস করি না। মন ঠিক এবং খাঁটি না করিতে পারিলে মানুষের পরিত্রাণ হয় না। পরিত্রাণের জন্য জীবন ভাল চাই। আরও বলি, আমি দশ বৎসর বয়সে এই বাড়ীতে আসিয়াছি, এবং এগার বৎসর হইতে ঘর করিতে আরম্ভ করিয়াছি, এই এগার বৎসরেই আমি হরিনামের মালা গ্রহণ করি। সেই পর্য্যন্ত এই বাড়ীতে কখনও খারাপ

কাজ দেখি নাই, সর্ব্বদাই সৎকর্ম্মে লিপ্ত থাকিতাম। ক্রমে ক্রমে ধর্ম্ম ধর্ম্ম একটা বাই হইল, তাহা হইতে শেষে তীর্থ দর্শনের একটা খুব ইচ্ছা দাঁড়াইল। আমি এখনও নিজে নানারূপ পূজা করি কিন্তু সমস্তই এই ভাব হইতে। আমার প্রাণের বিশ্বাস এই যে, এক ঈশ্বর এবং তাঁহার উপাসনা ভিন্ন আমার মুক্তি নাই। মানুষ যে সাকার উপাসনার দ্বারা মুক্তি পায় না, এই কথা আমি ঠিক বলিতে পারি না। নিরাকারের দ্বারা মানুষের মুক্তি হয়—ইহা আমি জানি এবং আমার নিজের মুক্তিও নিরাকারের উপর নির্ভর করিতেছে। আমি যে মুক্তি পাব এই আশা করি না; শুধু তাঁর পাদপদ্মে থাকিব—এই মাত্র ইচ্ছা। পুনর্জ্জন্ম সম্বন্ধেও আমার এই মত, পুনর্জ্জন্ম যে লোকের হয় তাহা আমি বলিতে পারি না; আর আমি সে বিষয় ভাবিও না। মরণের ভাবনাও আমি ভাবি না, তাঁর হাতে যদি পড়ি, তিনি যেখানে নিবেন সেখানেই যাইব, নরকেই নিন আর স্বর্গেই নিন্। সেই দিন নব রাত্রির সময় কেহ কেহ বলিতেছিলেন যে, "তিনি এইরূপ সুন্দর প্রার্থনা করেন আবার এদিকে এই সব করেন কেন?" ইহার কারণ উপরে যাহা বলিলাম, তাহাতেই প্রকাশ পাইবে।

হারা পঞ্চমীর পরদিন আমরা শ্রীক্ষেত্র হইতে পুনরায় বাড়ীর দিকে রওনা হইলাম। কটক পর্য্যন্ত

আসিয়া আমার খুড় শাশুড়ীর শক্ত ব্যামো হইল। সেই জন্য কটকে তিন দিন আমাদের থাকিতে হয়। তিন দিন পরে কটক হইতে বাহির হইলাম। কুড়ি দিন পরে কালীঘাটে আসিয়া পৌঁছিলাম। বাড়ীতে ইতিপূর্ব্বে উলুবেড়ে হইতে লোক পাঠাইয়া দিয়া বলিয়াছিলাম, যেন কালীঘাটে আমার ছেলেদের আনিয়া রাখা হয়, আমি যাইয়াই যেন দেখিতে পাই। আমি মনে মনে স্থির করিয়াছিলাম, যদি ছেলেদের কাহাকেও কালীঘাটে না পাই তবে বাড়ী আর ফিরে যাইব না। যতক্ষণ না তাহাদের দেখিব ততক্ষণ কালীঘাটেই পড়িয়া থাকিব। কালীঘাটে পৌঁছিয়াই দেখি, নবীন, কেশব, কৃষ্ণবিহারী, আর হারু (আমার দেবর মুরলী-ধর) দাঁড়াইয়া আছে। দেখে যে আমার কি আহ্লাদ হইল বলিতে পারি না। কৃষ্ণবিহারী আমায় দেখিয়াই কোলে আসিয়া উঠিল, কাপড় ধরিয়া রহিল। অন্যান্য সকলে দেখা করিয়াই চলিয়া আসিল, কৃষ্ণবিহারী আসিল না। বলিল, "মার কাছ থেকে আমি আর যাইব না।" আমার খুড় শাশুড়ী বলিলেন, "তোর মাকে আবার ধরিয়া লইয়া যাইব।" কৃষ্ণবিহারী বলিল, "আর ছাড়িয়া দিলে ত।" আমাকে পেয়ে যেন বর্ত্তে গেল। তখন তাহার বয়স ৪।৫ বৎসর হইবে। আমি কালীঘাটে পূজা দিয়া খাওয়া দাওয়া করে বিকালে বাড়ী এলাম।

সপ্তম দিবস—৮ই নবেম্বর, ১৮৯২।

শ্রীক্ষেত্রে যাইবার ছয় মাস পূর্ব্বে আমি গঙ্গাসাগরে যাই। একদিন দুপুরবেলায় আমরা খাইতে বসিয়াছি, সেই সময় আমার মা আমার বাপের বাড়ী গৌরিভা হইতে গঙ্গাসাগর যাত্রা করিবেন বলিয়া আমাকে দেখিতে আমাদের বাড়ী আসিলেন। তিনি গঙ্গাসাগর যাইবেন শুনিয়া আমিও তাঁহার সঙ্গে যাইব স্থির করিলাম। সকলে নিষেধ করিতে লাগিলেন। আমি শুনিলাম না। পাছে আমার ভাশুর যাইতে না দেন এই ভয়ে তাঁহাকে জানাইব না মনে করিলাম।

চুপি চুপি আমার পায়ের মল বিক্রী করিলাম, শেষে কিন্তু তাঁহাকে জানাইলাম। তিনি প্রথম বারণ করিলেন, শেষে যখন দেখিলেন যে আমি নিতান্তই যাইব স্থির করিয়াছি, তখন নবীনকে ডাকিয়া বলিলেন, "যদি তোর মা নিশ্চয়ই যান তবে সঙ্গে দারোয়ান এবং লোক জন দিস্, যেন একলা না যান। আমি শুধু একজন দারোয়ান ও খানসামাকে সঙ্গে লইলাম, এবং কোলের কৃষ্ণবিহারীকে লইয়া মার সঙ্গে যাত্রা করিলাম। রাস্তায় কৃষ্ণবিহারীর জন্য দুধ পাইতাম না, পাণে কিম্বা শালপাতায় করিয়া চাট্টি ভাত দিতাম। দুটী দুটী করিয়া তাই খাইত, এই রকমে

প্রথমে কৃষ্ণবিহারী ভাত খাইতে শেখে। আমরা উলুবেড়ে পঁহুছিয়া সকলে কূলে উঠিলাম। শুধু কৃষ্ণ-বিহারী আর একটী বামুনের মেয়ের কোলের খুকী নৌকায় খেলা করিতেছিল। এমন সময় একখানি জাহাজের ঢেউ লাগিয়া নৌকার মুখ ভাঙ্গিয়া গেল. নৌকায় হু হু করিয়া জল উঠিতে লাগিল। নৌকা ডুবু ডুবু হইল। আমি কাঁদিতে লাগিলাম, মনে করিলাম, বুঝি ছেলেটীকে হারাইলাম। মাঝিরা জলে সাঁতার দিয়া নৌকা কূলে টানিয়া আনিল এবং কৃষ্ণবিহারী ও সেই খুকীকে আনিয়া আমাদের কোলে দিল। চা'রি দিন পরে সাগর পৌঁছাই, তিন দিন সেখানে ছিলাম, পরে বাড়ী আসিলাম।

আমি শ্রাবণ মাসে শ্রীক্ষেত্র হইতে আসিলাম, তিন মাস পরে আমার সেজ মেয়ে চুণীর বিবাহ স্থির হয়। আমি শ্রীক্ষেত্রে যাইবার পূর্ব্বে, বিধবা হইবার পরে, আমার মেজ মেয়ে ফুলেশ্বরীকে বিয়ে দিই। আমার স্বামীর জীবিতাবস্থায় আমার বড় মেয়ে ব্রজে-শ্বরীর বিবাহ হয়। সেই সম্বন্ধ আর আমার ভাশু-রের বড় মেয়ে রাজেশ্বরীর (বেহারী গুপ্তের মা'র) সম্বন্ধ আমার শ্বশুর করিয়া গিয়াছিলেন। জুরুণী ও পত্তর হওয়ার পর আমার শ্বশুরের মৃত্যু হয়। তারি জন্য এক বৎসর পরে এই বিবাহ হয়। এই জুরুণী

পত্তর ও বিবাহ আমার জীবনের একমাত্র সুখের দিন। খুব ঘটা করিয়া এই দুই বিবাহ দেওয়া হয়। কাঁচড়াপাড়া নিবাসী শ্রীখণ্ডের বৈদ্য কুলীন প্রধান রায়ের দুর্য্যোদাসের সন্তান লক্ষ্মীনারায়ণ মজুমদারের সঙ্গে আমার প্রথমা কন্যার বিবাহ হয়। তখন পাত্রের বয়স তের এবং কন্যার বয়স দশ বৎসর। এই বিবাহের জুরুণী পত্তরের পর আমার শ্বশুর জামাইএর কুলের জন্য আহ্লাদ করিয়া আমার ননদ বিন্দুকে ডাকিয়া বলিলেন, "এবার আমার দরজায় হাতী বাঁধা হলো।" এই জামাইকে লইয়া আমার স্বামী বড়ই আহ্লাদ করিতেন। এমন কি, নিজের কাছে রাত্রে লইয়া শুইতেন। আমি তাহাকে নিজের ছেলের মত মানুষ করিয়াছি। স্নান করাইয়া দিতাম, গা মুছাইয়া দিতাম এবং মাছ বাছিয়া খাওয়াইয়া দিতাম।

আমার স্বামীর মৃত্যুর ২।৩ বৎসর পরে আমার মেজ মেয়ে ফুলেশ্বরীর বিবাহ হয়। কাঁচড়াপাড়ার কুলীন আনন্দচন্দ্র গুপ্ত আমার মেজ জামাই। বিবাহের সময় ফুলেশ্বরীর বয়স নয় এবং আনন্দের বয়স ১৭ বৎসর ছিল। এই বিবাহের সময় আমার শাশুড়ী জীবিত ছিলেন।

অষ্টম দিবস—১০ই নবেম্বর, ১৮৯২।

ফুলেশ্বরীর বিবাহের এক বৎসর পরে আমার শাশুড়ীর মৃত্যু হয়। তার এক বৎসর পরই আমার প্রিয়তমা ননদ বিন্দুর মৃত্যু হয়। আমি তাঁহাকে যেমন ভাল বাসিতাম, তিনিও আমাকে সেই রকম ভাল বাসিতেন। তাঁহার যাওয়ার সময় আমার অত্যন্ত কষ্ট হইয়াছিল। তাঁহাকে আমি বলিলাম, "তুমি চল্লে, আমি কি করিয়া থাকিব? আমি যে কিছুই জানি না।" তিনি বল্লেন, "আমি কি করিব, আমায় নিয়া যাইতেছেন, ইচ্ছা ছিল আরও কিছু দিন থাকিয়া তোমার সংসার গুছাইয়া দিই, তোমার সংসার তুমি গুছিয়ে করো।" বিন্দু ও শাশুড়ীর শোকের কিছুদিন পূর্ব্বে আমার স্বামীর মৃত্যুর দুই বৎসর পরে, আমার বড় মেয়ে ব্রজেশ্বরীর মৃত্যু হয়। এই মেয়ে যেমন ভাল ছিল, তেম্নি গুণ ছিল, মুখে কথাটী ছিল না। এত ভাল ছিল যে ভাত এক দিকে বিড়ালে খেলেও কিছু বলিত না। আমরা যদি কিছু বলিতাম তাহা হইলে বলিত, "আমি খাব ও খাবে না? খেলেই বা।" স্বামীর শোক সাম্‌লাইতে না সাম্‌লাইতে আমার প্রিয়তমা কন্যাটী যায়, আমি একেবারে অধৈর্য্য হইয়া গেলাম। ঘরে প্রবেশ

করিতাম না, বারাণ্ডায় পড়িয়া থাকিতাম। আমার সেই মেয়ে বাঁধাকপি খেতে চেয়েছিল। সেই পর্য্যন্ত আমি তাহা ত্যাগ করিয়াছি। যোগীন্, আমার এত কষ্ট হচ্ছে যে এই সব বল্‌ছি আর ইচ্ছা হচ্ছে তোমার সম্মুখে এখুনি কাঁদি। স্বামী ও কন্যার ভীষণ শোকের পর, শাশুড়ী আমার বড় ছেলে নবীনের বিবাহ স্থির করিলেন। আমার বড় ছেলে নবীনের, আমার ভাশুরের বড় ছেলে যদুনাথের এবং ছোট দেওর মুরলীধরের বিবাহ এক সঙ্গেই হয়। আমি বলিলাম, "আমি এখন উঠিতে পর্য্যন্ত অক্ষম, আমার ছেলের বিবাহ এখন থাক্।" আমার কথা কিন্তু শুনিলেন না, বিবাহ দিলেন। এই তিন বিবাহে অত্যন্ত ঘটা হইয়াছিল। গৌরিভা গ্রামে বিবাহ হয়। পাঁচ ছয় গ্রামে তত্ব বিলান হইয়াছিল। কলিকাতা হইতে এত রাজা ও বড় লোক গৌরিভায় গিয়াছিলেন যে, গঙ্গার অনেক দূর পর্য্যন্ত ঘাট এবং বজ্‌রায় আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছিল। কাঁচড়াপাড়া হইতেই তিন বৌ আনা হইয়াছিল। তিন জনই এক ঘরের (দুর্য্যোদাসের) মেয়ে। প্রথম দিন দেবরের, দ্বিতীয় দিন দুই ছেলের বিবাহ হয়। ছেলেরা বিবাহ করিয়া বৌ লইয়া ঘরে আসিল। তখন অনেক টাকার সিকি দুয়ানি ও পয়সা ছড়ান হইয়া-

ছিল। এক মাস পর্য্যন্ত যজ্ঞি হইয়াছিল। বিয়ের পরদিন শুধু মেয়ে কুটুম্বরা নবীনকে ও বৌকে যে টাকা দিয়াছিল, তাহা ১০০০ হাজার টাকারও অধিক হইয়াছিলেন। এই রকম তিন জনেরই হইয়াছিল। ফাল্গুন মাসে এই বিয়ে হয়, আর সেই কার্ত্তিকে আমার শাশুড়ীর মৃত্যু হয়। তিনি রক্তামাশয়ে মারা যান। আমার ছেলে যখন বিয়ে করিয়া বৌ লইয়া ঘরে আসিলেন, তখন শাশুড়ী বৌকে আমার কোলে দিয়া বলিলেন, "তুমি যে মেয়ের জন্য শোক করিতেছ এই সেই মেয়ে। ইহাকে সেই মেয়ের মতন দেখিয়া সব দুঃখ ভুলিয়া যাও।" আমি কোলে লইলাম, কিন্তু কাঁদিয়া বলিলাম, "কৈ ব্রজেশ্বরীর শোকত ভুলিতে পারিলাম না।" আমার শাশুড়ী ননদের মৃত্যুর পর আমি তীর্থ-ভ্রমণে বাহির হইলাম। সাগর ও শ্রীক্ষেত্রের কথা বলিয়াছি। শ্রীক্ষেত্র হইতে আসিয়া আমার সেজ মেয়ে চুণীর বিবাহ দিই।

সেজ মেয়ে চুণার বিবাহ।

আমার বড় জামাই লক্ষ্মীনারায়ণের সঙ্গেই সেজ মেয়ের বিবাহ হয়।* আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে এই বিবাহ হয়। পূর্ব্বে এক ধনবানের ছেলের সঙ্গে বিবাহের কথা ঠিক হইয়াছিল। শেষে আমার বড় মেয়ের মৃত্যুর পর সেই বিবাহের সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া ভাশুর বড় জামাইএর সঙ্গে চুণীর বিবাহ দেন। এই বিবাহ অতি গরিব ভাবেই হইয়াছিল। এমন কি, এক খানি কাপড় পর্য্যন্ত দেওয়া হয় নাই। আমারি এই মেয়ে অতি সুন্দরী। দশ বৎসর বয়সে এই মেয়ের বিবাহ হয়। এই বিবাহের দুই এক বৎসর পরেই ছোট মেয়ে পান্নার বিবাহ হয়। এই বিবাহ আমি নিজেই দিয়াছিলাম। টাকাকড়ি অবশ্য ভাশুরের হাতে ছিল, তিনিই সব খরচ পত্তর করিয়াছিলেন, কিন্তু পছন্দ করিয়াছিলাম আমি। আমাদের নিজ গ্রামের [illegible]-

* এই বিবাহে দুই পুত্র ও এক কন্যা, প্রথম পুত্র নরেশচন্দ্র মজুমদারের একমাত্র কন্যার সহিত ৺ চণ্ডীচরণ সেন মহাশয়ের পুত্র বারিষ্টার শ্রীযুক্ত নিশীথচন্দ্র সেনের বিবাহ হয়। কন্যা কুমুদিনী দেবীর সহিত কুচবিহারের প্রধান জজ শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ সেনের বিবাহ হয়। দ্বিতীয় পুত্র সুরেশ, নরেশ ও কুমুদিনী দেবীকে সারদাসুন্দরী নিজে পালন করেন ও নিজের কাছে রাখেন। যোঃ।

চন্দ্র রায়ের সঙ্গে আমার ছোট মেয়ের বিবাহ হয়। এই বিবাহে খরচপত্রের কোনও অভাব হয় নাই। এই মেয়েরও দশ বৎসর বয়সে বিবাহ হয়। সমস্ত মেয়ের বিবাহ হইয়া গেলে, অল্প কয়েক বৎসর পরে কেশবের বিবাহ হয়।

সর্ব্ব প্রথমে কেশবের ছেলেবয়স হইতে কাঁচরাপাড়ার শ্রীনাথ মজুমদারের মেয়ের সহিত তাহার বিবাহের প্রস্তাব হয়। মেয়েটী বেশ সুন্দরী ছিল, অনেক চুল ছিল। আমি বলিতাম, "এ তো আমার বৌ হইয়াই আছে।" এই মেয়েকে আমি পা মুছাইয়া দিতাম; কেশবের সঙ্গে একপাতে ভাত খাওয়াইয়া দিতাম; তাহার মাকে বেহান বলিতাম। এই মেয়ের সঙ্গে বিবাহ নিশ্চয়ই হইত, শুধু একটি কারণে আমার ভাশুর অমত করিলেন। কারণটি এই—আমার শ্বশুর যখন ব্যাঙ্কের দেওয়ান ছিলেন, সেই সময় একবারে ৩৪০০০ (চৌত্রিশ হাজার) টাকা চুরি যায়, তাহাতে সেই সময়ে সকলেই এই মেয়ের ঠাকুরদাদাকে সন্দেহ করিয়াছিল। আমার শশুর ইঁহাকে কর্ম্ম করিয়া দিয়াছিলেন। আমার ভাশুরেরও এই বিশ্বাস ছিল যে, টাকা চুরি যাওয়ার পর আমার শ্বশুরের মনের কষ্টে দমাব্যামো হয়। সেই ব্যামোতে এক এক বার তাঁর আধঘণ্টা পর্য্যন্ত দম্ আট্‌কে থাকিত। শেষে এই

ব্যামোতেই তাঁহার মৃত্যু হয়। এই কারণে আমার ভাশুর এই মেয়েকে তাঁহার পিতৃহন্তার পৌত্রী মনে করিয়া বিবাহে অমত প্রকাশ করিলেন। আমি কিন্তু এই মেয়েকে বড়ই ভাল বাসিতাম। শেষে এই মেয়ের সঙ্গে নববিধান প্রচারক শ্রীমান্ উমানাথ গুপ্তের বিবাহ হয়। এই মেয়ের প্রতি সেই পূর্ব্বেকার ভালবাসা আমি এখনও ভুলিতে পারি নাই।

এই সম্বন্ধের পর হাঁড়েলার এক সুন্দরী কুলীন কন্যার সহিত কেশবের বিবাহের প্রস্তাব হয়। আমার ভাশুর সেই মেয়ে সুন্দরী বলিয়া আপনার সেজ ছেলের সঙ্গে তাহার বিবাহ ঠিক করিলেন।

এই সম্বন্ধটি ভাঙ্গিয়া গেলে, বালির চন্দ্র মজুমদারের মেয়ে গোলাপ সুন্দরীর সঙ্গে কেশবের সম্বন্ধ ও বিবাহ হয়। এই মেয়ের সঙ্গে বিবাহ হওয়া আমার বেশ ইচ্ছা ছিল, কিন্তু যখন শুনিতে পাইলাম; মেয়ে তত সুন্দরী নয় এবং অতি ছোট, তখন আমার একটু অনিচ্ছা হইতে লাগিল। আমার ভাশুর মেয়েকে আশীর্ব্বাদ করিয়া আসিলেন। তিনি প্রশংসা করিলেন বটে, কিন্তু যে ভাবে বলিলেন, তাতে আমার বেশ মনে হইল, মেয়ে সুন্দরী নয়। তারপর আমি একবার যখন বড়বৌ ও ছোট মেয়েকে লইয়া বাপের বাড়ী যাইতেছিলাম, সেই সময় বালির ঘাটে নৌকা লাগা-

ইয়া বৌ ও ছোট মেয়েকে ঝিএর সঙ্গে মেয়ে দেখিতে পাঠাইলাম। তাঁহারা ফিরিয়া আসিয়া যাহা বলিলেন, তাহাতে আমার মন আরও খারাপ হইল। সে যাহা হউক, বিবাহ ঠিক হইল। বৌ ঘরে আসিল। বৌএর মুখ দেখিবার পূর্ব্বে আমার মন আরও খারাপ হইল, এমন কি কাঁদিয়া ফেলিলাম। আমার ভাশুরও অপ্রস্তুত হইয়া গেলেন; তাড়াতাড়ি নিজে বাতি লইয়া ধরিলেন, এবং আমায় বেশ করিয়া মুখ দেখিতে বলিলেন। মুখ দেখিয়া আমার মনটা ভাল হইল। মনে করিলাম, মুখখানি বেশ, পরে ভাল হইবে। বিবাহের সময় বৌ অতি ছোট, রোগা ও কাল ছিলেন, মাথার চুল আদপেই ছিল না। কেশব পরে ঠাট্টা করিয়া আমার মেয়েদের বলিতেন, "তোমরা আর কাহারও মেয়ে দেখিতে যাইও না।" কিন্তু বিবাহের পর তিনি একদিনের জন্যও দুঃখ করেন নাই। তিনি বৌকে কখনও বাপের বাড়ীতে রাখিতেন না। বৌ এত রোগা ও ছোট ছিলেন যে, কেশব যদি মন্দ ছেলে হইতেন, তাহা হইলে তাঁহার স্বভাব নিশ্চয়ই মন্দ হইয়া যাইত। কিন্তু কেশব ছেলেবেলা হইতে বৈরাগ্যভাবে পূর্ণ ছিলেন। সেই জন্য এই বিবাহেতে তাঁহার কোনও অনিষ্ট না হইয়া বরং ভালই হইল।

বিয়ের পর বৌ এক বৎসর বাপের বাড়ী ছিলেন, নয় বৎসর বয়সে আমি তাঁহাকে লইয়া আসি, সেই পর্য্যন্ত আমারই নিকট ছিলেন। আমার ও আমার বড় মেয়ে ফুলেশ্বরীর যত্নে বৌ ক্রমে ক্রমে সুশ্রী ও সুস্থ হইতে লাগিলেন, এবং শেষে অতি সুন্দরী হইলেন। ধর্ম্ম ভাবের সঙ্গে সঙ্গে বৌএর শ্রী ও সৌন্দর্য্য আরও বাড়িতে লাগিল।

ভাশুরের মেজ ছেলের অধিবাসের দিন নাচেতে তাঁর মেজ ছেলেকে গদিতে বসান হইয়াছিল। আমার ছেলের বিবাহের নাচের দিন আমার ভাশুরের সেজ ছেলের বিয়ের নাচ যে এক সঙ্গে হয়, ইহা আমার ইচ্ছা ছিল না। আমি বলিলাম, "আমার ছেলের বিবাহেতে ভিন্ন নাচ করিতে হইবে।" কারণ, আমার ছেলেকে এক-দিন নাচেতে আলাদা রূপার তক্তানামায় (চতুর্দ্দোল) বসাই, ইহা আমার বড় ইচ্ছা ছিল। কিন্তু তাহা হইল না। তিনি সেই দিন আপনার সেজ ছেলে-কেও কেশবের সঙ্গে গদীতে বসাইয়া দিলেন।

নবম দিবস—১৭ই নবেম্বর, ১৮৯২।

তীর্থভ্রমণ—কাশী, প্রয়াগ, বৃন্দাবন, মথুরা, বিন্ধ্যাচল।

কাশী যাইব, বড় আহ্লাদ হইল। আমার ভাশুর প্রায় সমস্ত খরচ দিলেন। আমার সঙ্গে দারোয়ান, চাকর ও চাকরাণী গিয়াছিল। তিনি সঙ্গে আরও দুই একজনকে দিলেন। এখান থেকে রাণীগঞ্জ পর্য্যন্ত রেলে গেলাম, তারপর ডাকগাড়ীতে কাশী ও প্রয়াগ ভ্রমণ করিলাম; প্রয়াগ হইতে নৌকা করিয়া বিন্ধ্যাচলে গেলাম। সেই সময় রাণীগঞ্জের ওদিকে আর রেল গাড়ী ছিল না। মাস কয়েক পর বাড়ীতে ফিরিলাম। কয়েক বৎসর পর আমার বড় জা বৃন্দাবন যাইবেন, ঠিক করিলেন। আমারও সেই সঙ্গে যাইবার ইচ্ছা হইল, আমার ভাশুরও মত দিলেন। কিন্তু আমার জার মত হইল না, সেই সঙ্গে আমার যাওয়া হইল না। ফিরে বৎসর আমি পুনরায় যাইতে চাহিলাম। পূজার ছুটী হল, নবীন আমায় সঙ্গে লইয়া যাইবেন ঠিক করিলেন। ভাশুরের নিকট খরচ চাহিলাম, তিনি যাহা দিলেন তাহা অতি সামান্য। নবীন ফিরাইয়া দিলেন। নবীনের এই কার্য্যে আমার মত ছিল না। কারণ, তাহাতে

ভাশুরের অপমান হইবার সম্ভাবনা ছিল। নবীন নিজে খরচ করিয়া আমায় লইয়া গেলেন। সেই বার আগ্রা অবধি রেল হইয়াছিল। প্রথম কাশীতে গেলাম। সেইখানে ১৫ দিন ছিলাম। অষ্টমীর দিন পূজার ফল ছাড়াইবার সময় হঠাৎ আমার ডান পা ধরিয়া গেল, চলৎশক্তি রহিত হইল। আমাকে ধরাধরি করিয়া উপরে লইয়া গেল। পায়েতে ৯টা জোঁক লাগান হইল। তারপর দিন পা একটু হাল্‌কি হইল। অষুধ ইত্যাদি খাওয়ার পর একটু ভাল হইলেই পুনরায় চলিতে আরম্ভ করিলাম। কাশী হইতে আগ্রা গেলাম। কাশী হইতে নবীন পাল্কী করিয়া আগে চলিয়া গেলেন, তারপর আমি উটের গাড়ী করিয়া আগ্রা হইতে বৃন্দাবন রওনা হইলাম।

দুর্ঘটনা।

উটের গাড়ী তিনতলা এবং ভয়ানক দোলে, সমস্ত রাত্রি চলার পর ভোরের সময় সমস্ত গাড়ী উল্টে পড়িয়া গেল। গাড়ীতে আমরা প্রায় ১০।১২ জন ছিলাম, এবং অনেক জিনিষ ছিল। যদিও আমরা রক্ষা পাইলাম, কিন্তু আমাদের পুরুতের মার জিভ

বাহির হইয়া গিয়াছিল। তিনিও শেষে কোন রকমে রক্ষা পাইলেন। গাড়ী উল্টে যাওয়া যেমন ভয়ানক, গাড়ীর উঠান আরও আশ্চর্য্য ব্যাপার। সেই বড় গাড়ী খানি খালি অবস্থায়ও তুলিতে গেলে প্রায় ১৫।২০ জন লোকের দরকার হইত, কিন্তু কি আশ্চর্য্যের বিষয়, অতবড় গাড়ী খানি ১০।১২ জন লোক এবং জিনিষ পত্র সহ হঠাৎ কে তুলিয়া দিলেন, আমরা কেহ জানিতে কিম্বা দেখিতে পাইলাম না। সেই সময় রাস্তায় কোনও লোক ছিল না। গাড়োয়ানকে জিজ্ঞাসা করিলাম, সেও আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, সে বলিতে পারে না। সকলে বলিতে আরম্ভ করিল, যাঁহাকে দেখিতে যাইব তিনিই তুলিয়া দিলেন। তার পরদিন বৃন্দাবনে পৌঁছিলাম। বৃন্দাবন ও মথুরায় তিন মাস ছিলাম। এই তিন মাসের ভিতর মথুরা, গোকুল, শ্যামকুণ্ড ও গিরিগোবর্দ্ধন দেখিয়া বৃন্দাবনে ফিরিয়া আসিলাম। আসিয়া আমি মচ্ছোব (মহোৎসব) দিলাম। সেইবার আমি চাতুর্মাসিক (চারিমাস অন্নত্যাগ) করিয়াছিলাম। রাধাকুণ্ডে যাইয়া সেই ব্রত উদ্‌যাপন করিয়া এক ভাতের মহোৎসব দিয়াছিলাম। এই ভাতের মহোৎসব এক চমৎকার ব্যাপার। কি যে আমোদ বলিতে পারি না! প্রত্যেক দেবালয়ে সিধে দেওয়া হইয়াছিল। সমস্ত রাত্রি

বৈষ্ণবেরা অন্ন ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিয়াছিল। বৃন্দাবনে মহোৎসবের পর নবীন কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন। কারণ, ছুটি ফুরাইয়া গিয়াছিল। রাধা-কুণ্ডের মহোৎসবের পর যখন পুনরায় বৃন্দাবনে ফিরিয়া আসিয়া বাড়ী রওনা হইবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলাম, তখন আমার বন দেখিবার কোনও সম্ভাবনা ছিল না। শুধু একজন কুটুম্বের উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া বন দেখিবার জন্য ব্যস্ত হইলাম। ব্রজবাসীরা আমায় ভয় দেখাইয়া বলিতে লাগিল, "নদী হাটিয়া পার হইবার সময় মরবে, ভেসে যাবে, পড়িয়া পা ভাঙ্গিবে।" তবু আমি ভয় পাইলাম না। আমি বলিলাম, "একবার বৈ ত দু'বার মৃত্যু হইবে না, আমি নিশ্চয়ই যাইব। তাহারা বলিল, "তুমি মরিলে আমরা বাবুকে (নবীনকে) যাইয়া কি বলিব?" আমি বলিলাম, "বলিও যে তোমার মার মৃত্যু হইয়াছে।" আমার এই রূপ দৃঢ় প্রতিজ্ঞা দেখিয়া ব্রজবাসীরা স্বীকৃত হইল। অনেক যাত্রী গেল না; শুধু আমরা ৭।৮ জন গেলাম। বৃন্দাবন হইতে রওনা হইয়া তিন দিনের পর আমরা কাম্যবনে পৌঁছিলাম। বনটী প্রায় ৯ ক্রোশ; দুইদিন উপবাসের পর এই ৯ ক্রোশ সেই দিনই আমি হাঁটিয়া পরিক্রম করিলাম। কাম্যবন একটী গ্রাম, এই গ্রামটী একটী নদীর

পারে স্থাপিত। আমরা যখন নদীর অপর পারে পৌঁছি তখন রাত্রি ৭॥৮টা হইবে। সেখানে অত্যন্ত ডাকাতের ভয়। সেই জন্য অতি সাবধানে সেই অন্ধকার রাত্রে পাহাড় ও জঙ্গলের ভিতর দিয়া সরু পথে আমরা সেই নদীর পারে পৌঁছিলাম। সকলে গাড়ীশুদ্ধ নদী পার হইল। আমি ও আর চারিজনে হাঁটিয়া পার হইব স্থির করিলাম। ব্রজবাসী আগে আগে মশাল জ্বালাইয়া ও লাঠি ধরিয়া চলিল। তাহার পর আমরা চারিজনে প্রত্যেকের কোমর জড়াইয়া ধরিয়া এই অন্ধকারময় রাত্রিতে বরফের মত ঠাণ্ডা নদীর বিপৎপূর্ণ জলে আস্তে আস্তে নামিয়া পার হইলাম; পার হইয়া এক ব্রজবাসীর বাড়ীতে আশ্রয় লইলাম। পর দিন ভোর ৪টার সময় বিমলাকুণ্ডের বরফের ন্যায় জলে ডুব দিয়া সেই ভিজা কাপড়েই বন পরিক্রম করিতে আরম্ভ করিলাম। সেই বনের ভিতর রাস্তায় আমরা স্থানে স্থানে যশোদাকুণ্ড, কৃষ্ণকুণ্ড ইত্যাদি অনেক কুণ্ড দেখিতে লাগিলাম। একটী একটী কুণ্ড পাইতাম তখনই আমি ঝুপ্ ঝুপ্ করিয়া তাহাতে পড়িতাম, এবং ডুব দিয়া ভিজা কাপড়ে উঠিয়া পুনরায় চলিতে আরম্ভ করিতাম। সমস্ত দিন ঘুরিয়া ঘুরিয়া সেই গ্রামের যত তীর্থ সব দেখিলাম। সন্ধ্যার সময় সেই গ্রাম ছাড়িয়া একটী স্থানে যাইয়া আশ্রয় লইলাম। সেই দিন শুধু দৈ আর

ছোলা ভাজা খাইয়া রহিলাম। তার পর দিন কোকিল-বনে গেলাম। সেই বনের বড়ই শোভা, সমস্তই তমাল বন। আমার মার মুখে শুনিয়াছিলাম, তমাল বৃক্ষের ছালে রাধাকৃষ্ণের নাম লেখা আছে, আমার তাহা দেখিবার বড় ইচ্ছা হইল। আমি একটী গাছের ছাল খুলিলাম। ছালের নীচে আমার মনে হইল, কালির ভূষোতে দেবনাগরির মত লেখা রহিয়াছে। আমি ততটা বুঝিতে পারিলাম না। কিন্তু যেন র এবং ধ এই দুইটী অক্ষর দেখিতে পাইলাম। সেইখানে এক সাধুর নিকট হইতে দুই কোষ দই খাইলাম, এবং তাঁহারই নিকট হইতে দুইটা মূলা চাহিয়া লইয়া খাইতে খাইতে চলিলাম। এইরূপ চলিতে চলিতে কোথাও একটী তেঁতুল গাছের তলা হইতে দুইটী তেঁতুল লইয়া তাহাই খাইতে খাইতে আবার চলিতে লাগিলাম, সেই দিন এই রূপেই কাটিল।, এইরূপ উপোসের পর উপোস চলিতে লাগিল, কোনও ক্লান্তি কিম্বা খিদে বোধ ছিল না, দেখিবার আমোদে মত্ত ছিলাম। আমি এই রূপে দধিসাগর, পবনসরোবর, সান্ত্বনকুণ্ড, মান সরোবর, কুসুম বন ইত্যাদি অনেক বন এবং কুণ্ড দর্শন করিলাম। ভাদ্র মাসে অনেক সময় যাত্রীরা ঠোঙ্গা পাইত (বড় বড় পাণের মত গাছের পাতা ঠোঙ্গার মত হয়ে টুপ্ টুপ্ করে পড়ে)। শুধু ভাদ্র মাসে ঐ

সব দেখিতে পাওয়া যায়, আমি যখন যাই তখন অগ্রহায়ণ মাস, সেইজন্য আমার ঠোঙ্গা দেখিবার কোনও সম্ভাবনা ছিল না। সেই দুঃখে, আমি যখন ললিত-কুণ্ডের ধার দিয়া যাইতেছিলাম, আমাদের ব্রজবাসীকে বলিলাম, "আমার কপালে ঠোঙ্গা দেখা হইল না।" এই কথা বলিতে না বলিতে হঠাৎ আমার সম্মুখে একটি ঠোঙ্গা টুপ্ করিয়া পড়িল। মহাবনের ভিতর আমি এইরূপ আর একটী পাইয়াছিলাম। সব শুদ্ধ দু'টী ঠোঙ্গা পাইয়া আমার যে কি আহ্লাদ হইল তাহা আর বলিতে পারি না।

দশম দিবস—আগষ্ট, ১৯০০।

আজ ৭।৮ বৎসর পরে * আবার বলিতেছি; ইহার ভিতর আমার শোকের উপর শোক হইয়াছে। মেয়ে গেল, নাত্‌বৌ মোহিনী, সরযূবালা গেল, নবীনের মেয়ে

---

* গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক চট্টগ্রামের রাঙ্গামাটীর নাবালক রাজা এবং তাঁহার ভ্রাতার অভিভাবক নিযুক্ত হইয়া কিছু কালের জন্য আমায় চট্টগ্রামে যাইতে হইয়াছিল; এইজন্য এবং সারদাসুন্দরীর কনিষ্ঠ পুত্র আমার স্বর্গীয় শ্বশুর কৃষ্ণবিহারী সেন মহাশয়ের মৃত্যুর দরুণ তাঁহার অত্যন্ত মানসিক কষ্ট হওয়াতে, কয়েক বৎসর লেখা বন্ধ ছিল। এবং সেই সময় তিনি পুনরায় তীর্থভ্রমণে বহির্গত হন্। পরে তিনি তীর্থ হইতে ফিরিয়া আসিলে এবং আমি চট্টগ্রাম হইতে

বিলু গেল, আমার মেজ বৌ গেলেন, শেষে আমার কৃষ্ণ-বিহারী পর্য্যন্ত গেলেন। এখন এক মাত্র ফুলেশ্বরী * আছেন। এখন আমার নিজের শরীর ও মন কিছুই ভাল নাই। মনেও সব ঠিক্ আস্‌ছে না। যাহা হোক্ তুমি যখন লিখিতে চাহিতেছ, তখন যাহা মনে আসে তাই তোমায় বলি।

আমার বৃন্দাবন দর্শনের কথাই বলিতে ছিলাম, সেখানে অনেক দেখিবার জিনিষ আছে। চরণপাহাড়ী একটী দেখিবার বস্তু। আল্‌তাপটী আমি যাই নাই। বড় চরণপাহাড়ীতে রাধার চরণচিহ্ন আছে। আমি তুলসী ও চন্দন সরাইয়া ফেলিলাম এবং যশোদাকুণ্ডের জল লইয়া তাহা ধুইয়া দেখিলাম তাহাতে বেশ আল্‌তার ছাপ আছে, আমার দাসী তারাকেও তাহা দেখাইলাম। সে তাহা দেখিয়া তাহার উপর পড়িয়া গড়াগড়ি দিয়া কাঁদিতে লাগিল।

ইতিপূর্ব্বে বৃন্দাবনে নবীন আমার জন্য লুচির মস্থাব দিয়াছিলেন। আবার রাধাকুণ্ডে আমি ভাতের মস্থাব

কলিকাতায় আসার পর পুনরায় লেখা আরম্ভ করি এবং ইং ১৯০০ সালের আগষ্ট মাসেই সমস্ত লেখা শেষ করি। কারণ, আমার পুনরায় বদলীর সম্ভাবনা ছিল। যোঃ।

* সারদাসুন্দরীর মৃত্যুর বৎসরেক পূর্ব্বে ফুলেশ্বরীরও মৃত্যু হয়। যোঃ।

দিলাম। সে এক অপূর্ব্ব ব্যাপার, কত বামুন বৈষ্ণব একত্রে বসিয়া খাইলেন।

মথুরায় তোমার ঠাকুরদাদার শ্রাদ্ধ করিলাম, তাঁহাতে সমুদায় রূপার দান ইত্যাদি দিতে হইয়াছিল। আমি চারিমাস বৃন্দাবনে কাটাইয়া পরে কাশী আসিলাম, সেখানে দিন তিনেক থাকিয়া গয়াতে গেলাম, সেখানে বার দিন ছিলাম। আমি পাঁচ জায়গায় পিণ্ড দান করিলাম। তার পর বাড়ী আসিলাম। ইহার পর আমি আরও কয়েকবার তীর্থ দর্শনে গিয়াছিলাম। তাহার মধ্যে বৃন্দাবনে তিন বার, জয়পুরে দুইবার—একবার কৃষ্ণবিহারীর সঙ্গে যাই। কেশবের সঙ্গে নৈনীতাল, মুশুরী পাহাড়, লাহোর, লক্ষ্ণৌ, অমৃতসর, কুরুক্ষেত্র এবং ইহার ভিতর অন্যান্য ছোট ছোট স্থান সব দর্শন করিয়াছিলাম।

আমি নববিধান-প্রচারক শ্রীমান্ প্যারীমোহন চৌধুরীর সঙ্গে হরিদ্বার দেখিতে যাই। মুশুরী পাহাড়ে আমার সঙ্গে প্রচারক বিজয়কৃষ্ণ, ত্রৈলোক্য, অমৃত, মহেন্দ্র ও হরনাথ বোস্ ইত্যাদি ছিলেন। দেরাদুনের গুহ্যপানী ও নালাপানী বড় চমৎকার, দেখলে ভয় করে। পাহাড়ের গুহার ভিতর অন্ধকার, সেখানে কোন খানে হাঁটু জল, কোন খানে কোমর জল, কোন খানে বুক জল, কোন খানে আবার পা ডুবে না, সব অন্ধকার।

কেশব ও বাবুরা লাঠী ধরিয়া আস্তে আস্তে সে গুহার ভিতর দিকে—কোন্ খান থেকে জল আসিতেছে দেখিবার জন্য চলিয়া গেলেন। আমার বড় যাইবার ইচ্ছা হইল, কিন্তু খানিক দূর গিয়াই পা পিছ্‌লে ভয়ানক পড়িয়া গেলাম। কি করিয়া যে বাঁচিলাম বলিতে পারি না। বোধ হয় এ সব কষ্ট ভুগিবার জন্য তখন বাঁচিয়া আসিলাম। অনেক কষ্টে উঠিয়া গুহ্যপানীতে আসিয়া বসিয়া রহিলাম। শেষে সন্ধ্যার সময় বাবুরা ফিরিয়া আসিয়া সেখানে চড়িভাতি করিয়া খাইলেন। আমার পা ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল, হাঁটিতে পারিলাম না। কেশব ও বাবুরা একটী বাঁশ আনিলেন, আমি তাহাতে জড়াইয়া রহিলাম, তাঁহারা আমায় কাঁধে করিয়া বাসায় আনিলেন। আমরা দেরাদুনে গোপালচন্দ্র সরকারের বাড়ীতে ছিলাম। গোপালবাবুর স্ত্রী আমার মেয়ের মতন আমায় যত্ন ও সেবা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের কত উপদ্রব করিয়াছি। এখন একবার তাঁহাকে বড় দেখিতে ইচ্ছা করিতেছে। এই গোপালবাবুর বাড়ীতে প্রায় দু'মাস ছিলাম। আমার পা সারিলে লাহোরে গেলাম। পথে আমার সমস্ত জিনিস চুরি গেল, এমন একখানি কাপড় ছিল না যে আমি স্নান করিয়া পরি। প্রচারক প্যারীমোহন সঙ্গে ছিলেন, কিন্তু তিনি তখন এত ভাল মানুষ ছিলেন যে, নামিয়া দেখিতে পারিলেন

না। তিন দিন ভিজা কাপড়ে থাকি, পরে অমৃতসরে আসিলে, প্রচারক মহেন্দ্রবাবুকে টাকা দিলাম। তিনি এক থান কাপড় কিনিয়া দিলেন, পরিয়া বাঁচিলাম। আমি আম্বালা হইতে কুরুক্ষেত্রে গেলাম, থানেশ্বরের মহাদেব দেখিতে বেশ। কুরুক্ষেত্রের মধ্যে দেখিবার জিনিস বাণগঙ্গা ও পদ্মপুকুর। কুরুক্ষেত্রের নিকট এক খানি কালীবাড়ী আছে। তাহাতে আমাদের কাঁচরা-পাড়ার ব্রাহ্মণ মোহান্ত আছেন। সেখানে এক বাবু আমার নবীনের সঙ্গে চাকুরী করিতেন, তিনি আমায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কেশব বাবুর মা, আপনি কেন তীর্থ করিতে আসিয়াছেন?" আমি বলিলাম, "তীর্থ এক একটী পুরাতন স্থান এবং ভগবানের রাজ্য, দেখিতে দোষ কি?"

দারোয়ান রামগোলাম আমার সঙ্গে ছিল। আমরা রাস্তা ভুলিয়া ফিরিবার চেষ্টা করিতেছিলাম। বড়ই কান্না পাইতেছিল। কিন্তু সেই সময় এক জন একা গাড়ীর গাড়োয়ান আসিয়া আমরা কুরুক্ষেত্রে যাইব কিনা জিজ্ঞাসা করিল এবং সেই গাড়োয়ান সঙ্গে করিয়া আমাদের দেশের লোকের কালীবাড়ীতে লইয়া গেল। তার পর দিন কুরুক্ষেত্রে যাই।

কুরুক্ষেত্র হইতে কাশীতে ফিরিয়া আসিতেছিলাম; সেই বার চন্দ্রগ্রহণ ছিল। মাঝে এক জায়গায় আসিয়া

আমার সমস্ত টাকা ফুরাইয়া গেল, একেবারে নিরুপায় হইয়া বসিয়া কাঁদিতেছি, এমন সময় একটী ব্রাহ্মণের ছেলে আসিয়া আমার অনেক যত্ন করিলেন এবং শেষে, আমার কি দুঃখ তাহা জানিবার জন্য খুব ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। তাঁহার ব্যগ্রতা দেখিয়া আমি টাকার কথা বলিলাম, তিনি আমায় টাকা আনিয়া দিলেন, আমি সেই টাকার দ্বারা কাশীতে আসিলাম। পরে সেই টাকা, ব্রাহ্মণের ছেলে যাঁহাকে দিতে বলিয়াছিলেন, তাঁহাকে পাঠাইয়া দিই। সে ছেলেটী দেখিতে অনেকটা ধর্ম্ম-পালের মত।

কাশীতে গিয়া দেখি, কেশবও সেই সময় কাশীতে আসিয়াছেন।

কাশীতে কুচবেহারের গুজরাটি রাণীর সঙ্গে দেখা হয়, তখন তাঁহার বয়স প্রায় ৮০ বৎসর। তিনি একজন গুজরাটের অতি ভাল সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণের মেয়ে ছিলেন। বর্ত্তমান মহারাজার প্রপিতামহ (নামটী ভুলিয়া গিয়াছি), এই মেয়েটীকে বিবাহ করিয়া লইয়া আসেন। পরে তিনি কুচবেহারে আসিয়া যখন শুনিলেন যে মহারাজা ব্রাহ্মণ নহেন, তখন তাঁহার মনে বড় ঘৃণা হইল। তিনি কুচবেহার ত্যাগ করিয়া কাশীবাসী হইলেন। তাঁহার সঙ্গে তাঁহার এক ভাই ছিলেন। তিনি রান্না করিতেন ও দু'জনে তাহা খাইতেন। গুজরাটি রাণী কাশীতে

থাকিবার জন্য আমাকে খুব অনুরোধ করিতে লাগিলেন। আমি চলিয়া আসিলাম।

যখন জয়পুরে যাই তখনকার একটি ঘটনা আমি বলিব। সকাল বেলায় গোবিন্দজীর আরতি দেখিবার জন্য আমি আমার ভাশুরের (হরিমোহন সেনের) বাড়ী হইতে গাড়ী ভাড়া করিয়া রওনা হইলাম। গাড়ী হইতে নামিয়া কেমন এক রকম মন হইল, ছুটিয়া আরতি দেখিতে চলিলাম। রাস্তায় গিয়া গোবিন্দজীর মন্দিরে যেমন উঠিতে যাই এমন সময় দেখিলাম যেন গোবিন্দজী আসিয়া আমায় আট্‌কাইয়া রাখিলেন, আমি থমুকে দাঁড়াইলাম, অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া শেষে যেন তাঁহাকে সরাইয়া ফেলিয়া আরতি দেখিতে ছুটিলাম। এখন হইলে আমি ঐ রকম করিতাম না। এখন আমি বুঝিতেছি যে গোবিন্দজীর ইচ্ছা ছিল না যে আমি সাকার ভাবে তাঁহাকে দেখি। কেন যে আমি কেশবকে ছাড়িলাম? তাই এত কষ্ট হইতেছে। তিনি আমায় নৈনীতালে তাঁহার সিদ্ধিস্থান হিমালয়ে লইয়া যাইতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু আমার যাওয়া হইল না।

আমার তীর্থভ্রমণ সম্বন্ধে আমি কাল নির্দ্দিষ্ট করিয়া বলিতে পারিলাম না। সব তীর্থ আমি এক সঙ্গে যাই নাই, ক্ষেপে ক্ষেপে করিয়াছি। আমি ২৫ বৎসর বয়সে বিধবা হই। বিধবা হইবার দেড় বৎসর পরে (কৃষ্ণ-

বিহারীর তিন বৎসর বয়সে) আমার প্রথম তীর্থভ্রমণ আরম্ভ হয়। সে বার আমি সাগর যাই, তার পর আর একবার গিয়াছিলাম। আমার শেষ তীর্থভ্রমণ নবীনের ছেলে মোহিতের সঙ্গে কাশী বৃন্দাবন দর্শন, কৃষ্ণবিহারী যাইবার ৬ মাস পরে (১৮৯৫ ইং, অক্টোবর, নবেম্বর)। প্রায় ৪৪ বৎসর ব্যাপিয়া আমি এই তীর্থভ্রমণ করিয়াছি। কিন্তু কোন্ সময় কোথায় গিয়াছিলাম আমার এ ঠিক করিবার আর এখন শক্তি নাই।

বিষয়বিভাগ।*

আবার সংসারের কথা শুনিতে চাহিতেছ, বলি, সব ভাল মনে নাই। আমি যে বার শ্রীক্ষেত্রে যাই, সেইবার আমার ভাশুর অস্থাবর বিষয় ভাগ করেন। নবীন আমাকে অনেক করিয়া থাকিতে বলিয়াছিলেন। আমি কিন্তু ঐ সব তুচ্ছ বিষয়ে মন না দিয়া শ্রীক্ষেত্রে চলিয়া যাই। আমি যাওয়ার পর টাকা, মোহর এবং রূপার বাসন ভাগ হয়। মোহর পালি মাপিয়া ভাগ হইয়াছিল। ঠাকুরের সোণা রূপার জিনিষ ভিন্ন এক

* দেওয়ান রামকমল সেন ও প্যারীমোহন সেনের উইলের নকল "ক" পরিশিষ্টে দেখুন। যোঃ।

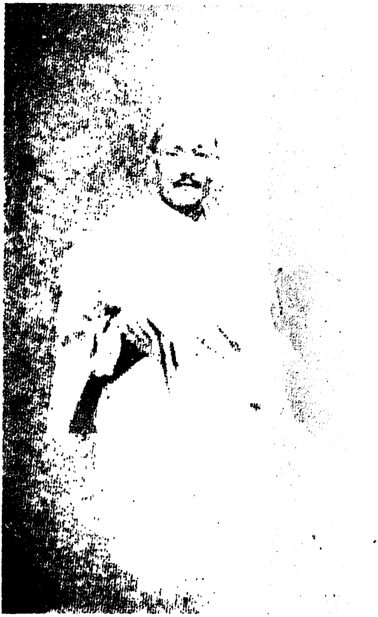
এক ভাগে অনেক রূপার জিনিষ পড়িয়াছিল। ভাগ করিবার সময় আমার ছেলেরা কিছুই পান নাই। নবীন যখন আমার ভাশুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "জ্যেঠামহাশয়, আমাদের ভাগ কোথায়?" তিনি বলিয়াছিলেন, "তোমাদের ভাগ আমার কাছে রহিল।" শেষে অনেক দিন পরে যখন আমার ভাশুরের ধেরোরা তাঁহার ধারের জন্য বাহিরের ফটকে চাবি দিলে, তখন বাহিরের সেই তেতালা হইতে ঝুড়ি ঝুড়ি সব রূপার বাসন ভিতর বাড়ীতে আনা হইতেছিল। আমি সেই সময় ঐ ঘরের দরজায় বসিয়াছিলাম। তখন আমার ভাশুরের মেজ ছেলেকে বলিলাম, "আমার ছেলেরা কিছুই পায় নাই, তাহাদের বাসনগুলা দাও।" আমার এ কথায় তিনি এক ঝুড়ি হইতে কয়েক খানি বাসন লইয়া আমায় দিলেন। কিন্তু তাঁহারা যাহা পাইয়াছিলেন তার সঙ্গে এদের ভাগ কিছু নয় বলিলেও হয়। আমার ভাশুরের নিকট যে আমার ছেলেদের মোহর ছিল, তাহা আমার ছেলেরা শেষে পাইলেন না, কারণ তখন আমার ভাশুরের অনেক দেনা হইয়াছিল, এবং সেই দেনার দরুণ তাঁর কষ্ট দেখিয়া আমিও আর চাহিতে পারিলাম না। আমার শ্বশুর যাওয়ার সময় সোণারূপার বাসন ভিন্ন তাঁর চারি ছেলের প্রত্যেককে ৮০,০০০ হাজার করিয়া নগদ টাকা দিয়া গিয়াছিলেন। এই সমস্তই আমার

ভাশুরের নিকট ছিল। কলিকাতায় আমার শ্বশুরের প্রায় সতের খানা বাড়ী ছিল। এত দিন আমার সে সব ঠিক মনে নাই, তার ভিতর খুব বড় বড় কয়েক খানির কথা বলিতেছি। চৌরঙ্গীতে তিন খানি, বড় বাজারে অনেক যায়গা ও একটী বড় বাড়ী, পটলডাঙ্গার স্কুলবাড়ী (এল্‌বার্ট কলেজ, এই বাড়ীটী তাঁর গুরুর জন্য হইয়াছিল, তিনি আসিলে ঐ খানে থাকিতেন।) নীচু বাগানের ও মাণিকতলার বড় বাগানবাড়ী, খালের ধারের ধেনো জমি ও অনেক যায়গা এবং শিবপুকুরের নিকট অনেক যায়গা। এইরূপ এক এক বাড়ীর ৩০০। ৪০০ শত টাকা করিয়া মাসে মাসে ভাড়া আসিত। কলিকাতার বাড়ীতে আমার শ্বশুর প্রায় ৮।১০ লাখ টাকার বিষয় রাখিয়া যান। সোণা, মুক্তা ও জড়োয়ার গহনা প্রায় ৫০,০০০ হাজার টাকার কম নয়। আমার ছেলেদের ভিতর নবীন ২০,০০০ ও কেশব ২০,০০০ করিয়া পাইয়াছিলেন। নবীন ২০,০০০ হাজার টাকা প্রথমেই পাইয়াছিলেন, কারণ সকলেই তাঁহাকে একটু ভয় করিতেন। কেশব প্রথমে টাকা পান নাই, শেষে যখন তিনি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিকট মেজ বৌকে লইয়া যান, এবং তাঁহার এ বাড়ীতে আসা ও খরচ আমার ভাশুর বন্ধ করিয়া দেন, তখন কেশব উকীলকে দিয়া তাঁহার ২০,০০০ হাজার টাকার জন্য নালিশ করিতে

চাহিলেন। তারপর আমার ভাশুর কেশবের ২০,০০০ হাজার টাকা এবং তাঁহার ভগ্নীদের টাকা বাহির করিয়া দিলেন। সেই সময় কেশব আমায় বলিয়াছিলেন, "মা, তুমি বল ত কৃষ্ণবিহারী ও তোমার জন্য উকীলের চিঠী দিয়া তোমাদের টাকাও বাহির করিয়া নিই।" আমি বলিলাম, "না টাকা কি বড় জিনিষ? টাকার জন্য তোমার জ্যেঠা কি জেলে যাবেন? যাক্ এখন নিয়ে দরকার নাই।"

আমি নালিশ কাহাকে বলে জানিতাম না, নালিশের নামে ভয় হইল। আমার অমতের জন্য কৃষ্ণবিহারীর ও আমার টাকা বাহির হইল না। আমার জন্যই কৃষ্ণবিহারীর টাকা গেল, কিন্তু সে জন্য কৃষ্ণবিহারী এক দিনও দুঃখ করেন নাই। কলিকাতায় যে সমস্ত বাড়ী ছিল তার ভাড়া আমার সব ছেলেরা নিয়মিতরূপে পাইয়াছিলেন। আমার ছেলেদের ভাগে যে সমুদায় বাড়ী ছিল, তার মধ্যে চৌরঙ্গীর বির্জ্জিতলার দুইটী বড় বাড়ীও ছিল। মাণিকতলার ধেনো জমীও পাইয়াছিলেন, সেই জমীর খাজানা এখনও আমার নাতিরা পায়। গহনা আমার ছেলেরা তেমন কিছুই পান নাই, নবীন ও কেশব যা অল্প পাইয়াছিলেন, কৃষ্ণবিহারী কিছুই পান নাই। ছেলেরা যে সব বাড়ী পাইয়াছিলেন, তাহা কোথায় গেল, কি হইল তাহা কিছুই জানি না। শেষে

আমার ভাশুর এবং ভাশুরের ছেলেরা যখন দেনার দায়ে সব সোণা রূপার বাসন লইয়া রাতারাতি জয়পুরে চলিয়া যাইতেছিলেন, নবীন আমাকে না জানাইয়া দারোয়ানকে হুকুম দিয়া সমস্ত জিনিষ আট্‌কাইলেন। যদু ও মোহিন আসিয়া বলিলেন, "মেজখুড়ি, নবীনকে আমার জিনিষ ছেড়ে দিতে বল, আমি যতদিন বেঁচে থাকিব, তোমার কখনও কষ্ট হইতে দিব না।" আমি এ কথা শুনিয়া নবীনকে ডাকিয়া বলিলাম, "তোমার দাদার জিনিষ ছেড়ে দাও। কাউকে কষ্ট দিয়ে কাজ নাই।" ছেলেরা জিনিষ লইয়া জয়পুরে গেলেন, কিন্তু যদুর ধর্ম্ম যদু রক্ষা করিয়াছেন। তিনি মাসে মাসে এখনও আমাকে সাহায্য করিতেছেন। আমার শ্বশুরের এত বিষয় আমার কপালদোষে নষ্ট হইয়া গেল। আমার ছেলেরাও বিষয়ী ছিলেন না। তাহারই জন্য নবীন প্রায় সমস্ত বিষয় নিয়ম মত পাইয়াও রক্ষা করিতে পারিলেন না। কলুটোলার বাড়ী প্রথমে শ্বশুরের বড় ও মেজ ছেলের ভাগে পড়ে। শেষে বড় ছেলের ভাগ শ্বশুরের ছোট ছেলে কিনিয়া রাখিলেন। আমার স্বামীর অংশ আমার তিন ছেলেরা পাইলেন। কেশবের অংশ কৃষ্ণবিহারী ও আমার দুই মেয়ে কিনিয়া রাখিলেন। তিনি নারিকেলডাঙ্গায় যাইয়া বাড়ী করিলেন।



স্বর্গীয় নবীনচন্দ্র সেন

(জন্ম—২৫এ সেপ্টেম্বর ১৮৩৩ মৃত্যু—
২রা সেপ্টেম্বর ১৮৮৯)

পুত্র কন্যা।

মেয়েদের বিষয় পূর্ব্বে বলিয়াছি। প্রথম পুত্র নবীন;—আমার তের বৎসর বয়সে নবীনের জন্ম হয়, তিনি প্রথম সন্তান। তিনি প্রায় ৫৭ বৎসরে মারা যান। তিনি বরাবরই রোগা ছিলেন, তিনি হিন্দু কলেজে পড়িতেন। পড়াশুনায় তিনি চিরকালই মনোযোগী ছিলেন, তাঁহার নিকট কেহ দাঁড়াইতে পারিত না। তিনি চিরকাল স্বাধীন প্রকৃতি বিশিষ্ট এবং গম্ভীর ছিলেন। অন্যান্য ভাই ভগ্নীরা তাঁর সম্মুখে কথা কইতে ভয় করিত। তিনি কিন্তু যখনও কাহারও প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার করেন নাই। তিনি যা করিতেন, অতি নিয়মে করিতেন, কখনও নিয়মের বাহিরে যাইতেন না।* কেশব ও কৃষ্ণবিহারীর কোন নিয়ম ছিল না। মা যা করিতেন তাহাতেই তাঁহারা সন্তুষ্ট থাকিতেন। নবীন যদিও বিষয় প্রায় সমস্ত পাইয়াছিলেন, কিন্তু কোম্পানির কাগজের সেয়ার

* (১) ইঁহার মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব্বে আমার বিবাহ হয়, আমি দেখিয়াছি, রোগ শয্যায় মৃত্যুর দুই এক ঘণ্টা পূর্ব্বে আসন্ন মৃত্যু জানিয়া পাত বাদাম ওয়ালীর প্রাপ্য সামান্য হিসাবটী পর্য্যন্ত ঠিক করিয়া মূল্য চুকাইয়া দিলেন, এবং তাহা নোটবুকে লিখিয়া রাখিলেন। যোঃ।

কিনিয়া অনেক টাকা নষ্ট হয়। তাহারই জন্য শেষে তাঁর অনেক অর্থকষ্ট হইয়াছিল। তিনি বহুমূত্র রোগে মারা যান।*

কেশবচন্দ্র।

আমার ১৭ বৎসরে কেশবের জন্ম হয়। নবীনের ছোট আমার মেয়ে ব্রজেশ্বরী, তার ছোট কেশব। অগ্রহায়ণ মাসে শুক্লপক্ষে দ্বিতীয়া তিথিতে সোমবার ভোরে ৭টার সময় ঐ নীচের, যেই ঘরটী তোমায় দেখাইয়া দিয়াছি, সেই ঘরে, এবং যে স্থানে আমার দেখান মত তুমি বেদি করিয়া দিয়াছ, ঠিক সেই স্থানে তাঁর জন্ম হয়। সেই ঘরে সুধু আমার ননদের এক মেয়ে হইয়াছিল। সেই ঘরটী শ্বেত্‌খানার পথে ছিল, নবীনের বড় ব্যামো বলিয়া আঁতুর ঘর প্রস্তুত হয় নাই। তাই তাড়াতাড়িতে সেই ঘরেই কেশবের জন্ম হয়। ঘরটী এত খারাপ ছিল যে, কেশবের

* (২) নবীনবাবুর চারি পুত্র—অমৃতলাল, নন্দলাল, ডাক্তার মোহিতলাল ও প্রমথলাল। নন্দলাল ও প্রমথলাল চিরকুমার ব্রত গ্রহণ করিয়া নববিধান ধর্ম্ম প্রচার করিতেছেন। নন্দলালের প্রধান কার্য্যক্ষেত্র করাচি। নবীন বাবু হিন্দু এনিউটী ফণ্ডের অন্যতম স্থাপয়িতা। যোঃ।



ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন

(জন্ম—১৯ নবেম্বর ১৮৩৮ মৃত্যু—
৮ জানুয়ারী ১৮৮৪)

জন্মাবার একটু পরেই তাঁর পেট ফেঁপে গিয়াছিল। নয় বৎসর পর্য্যন্ত তিনি বেশ সুস্থ ছিলেন। নয় বৎসর বয়সে তাঁর মূর্চ্ছা রোগ হয়। এক দিন স্কুলে যান, সেই খানেই রোগ আরম্ভ হয়। মাষ্টার একটী বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, কেশব জবাব দিতে পারিলেন না, কারণ তখন রোগের আরম্ভ হইয়াছে। মাষ্টার মনে করিল, বলিতে পারিবে না বলিয়া কথা কহিতেছে না। এই মনে করিয়া এক খানি ছুরি দিয়া কেশবের হাতের চেটো বিদীর্ণ করিয়া দিয়াছিল, তাহাতে তিনি অজ্ঞান হইয়া মাটিতে পড়িয়া যান, শেষে বাড়ীতে আনিয়া সুস্থ করা হয়। এই মূর্চ্ছা রোগ প্রায় দুই বৎসর ছিল, শেষে ভাল হইয়া যান। তার পর আর কোন বিশেষ রোগ হয় নাই। তিনি এত সুন্দর ছিলেন, যে সকলে তাঁহাকে গোঁসাই বলিত! তাঁহার কোন দোষ ছিল না। চিরকাল যেন ধোয়া পোঁছা— পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। কেশব নবীনকে ভয় করিতেন এবং মান্যও করিতেন। ছোট ভাই বোন্‌দের বিশেষ কৃষ্ণবিহারীকে ছেলেবেলা হইতে বড় ভালবাসিতেন। কারণ, কৃষ্ণবিহারী অতি ভালমানুষ ছিলেন। কখনও কাহারও সহিত ঝগড়া করিতেন না। কৃষ্ণবিহারী শুধু আমার ও বড় বৌয়ের সঙ্গে আব্দার করিতেন। বাড়ীতে এত ছেলে মেয়ে ছিল, কাহারও সহিত কেশব কিম্বা

আমার অন্য ছেলে মেয়েরা ঝগড়া করেন নাই। কেশব সকলের সহিত খেলিতেন, কিন্তু গলাগলি ভাব কাহারও সঙ্গে ছিল না। কেবল আল্‌গা আল্‌গা থাকিতেন। তিনি হিন্দুকলেজে পড়িতেন। কেশব কখন স্কুল ছাড়িয়াছেন বলিতে পারি না। স্কুল ছাড়িয়া ব্যাঙ্কে কাজ করেন, টাঁ্যাকশালেও এক মাস কাজ করিয়াছিলেন।

এক দিন কেশব খেলিতে খেলিতে হঠাৎ আমার মেজ মেয়ের চোখে বল ছুড়িয়াছিলেন, অবশ্য না জানিয়া। পূর্ব্বে থেকেই এই মেয়ের চোখের রোগ ছিল, কিছু কিছু ভাল হইতেছিল, কিন্তু কেশবের এই অজ্ঞানিত আঘাতে আমার মেয়ের চিরকালের মত চোখ্‌টী যায়। কেশব দুঃখে এবং ভয়ে একেবারে জড়সড় হইয়া গিয়াছিলেন। তখন কেশবের বয়স ৬।৭ বৎসর ছিল। আমার শ্বশুর এ বাড়ীতে প্রত্যেক ছেলেকেই পাঁচ বৎসর হইলেই হাতে এক ছড়া তুলসীর মালা দিয়া হরিনাম দিতেন. কেশবকেও সে রকম দিয়াছিলেন ; অন্য ছেলেরা সে নাম সর্ব্বদা করিতেন না। কেশব কিন্তু সে নাম ছাড়িলেন না, সেইটী বরাবরই ছিল। সব সময় তিনি হরিনাম লইয়া থাকিতেন, শেষে এই হরিনামে জগৎ মোহিত করিলেন। তিনি ছেলেবেলায় অনেক রকম

খেলিতেন, যাহা দেখিতেন, তাহাই নকল করিয়া খেলিতেন। কত বাজি করিতেন, যাত্রা করিতেন, সাহেব সাজিতেন, কখনও পুরুত হইয়া পূজা করিতেন, কখন বা গুরুমহাশয় হইয়া ছেলেদের শিক্ষা দিতেন। এই সকল বিষয় অনেকে লিখিয়া লইয়াছেন। আর লিখিবার দরকার নাই।

কেশব সন্দেশ ও রসগোল্লা বড় ভালবাসিতেন। তিনি ছোটবেলায় একদিন আমার কাছে চারিটী সন্দেশের জন্য আব্দার করিয়াছিলেন বলিয়া আমি বড় মারিয়াছিলাম। সেই জন্য তিনি বড় কাঁদিয়াছিলেন। আমার শ্বশুর তাঁর কান্না শুনিয়া উপর থেকে নামিয়া আসিয়া বলিলেন, "কেন কাঁদিতেছে?" (তিনি কেশবকে বড় ভালবাসিতেন) আমার ননদ বলিলেন, "কেশব ৪টা সন্দেশ খাইতে চাহিয়াছে বলিয়া বৌ মারিয়াছেন।" ইহা শুনিয়া আমার শ্বশুর বড়বাজার হইতে ১২ ঝুড়ি সন্দেশ আনাইলেন, এবং আমায় বলিলেন, "আমি ওদের জন্য রোজ ৫০।৬০ টাকার উপর আনিতেছি, উহারা যাহা খাইতে চাহিবে তাই দিবে, কখনও মারিবে না।" কেশব এক ঝুড়ি হইতে খাইলেন; তাঁর খাওয়া হইয়া গেলে পর অন্যান্য ছেলেদের দেওয়া হইল। বাদবাকী চার ঝুড়ি সন্দেশ ছিল। আমার শ্বশুর কেশবকে বলিলেন, "দুই ঝুড়ি তোমার মা খাইবেন, আর

দুই ঝুড়ি তোমার বুড় নানী খাইবেন।" এই বলিয়া তিনি দুই ঝুড়ি আমায় দিলেন ও দুই ঝুড়ি আমার শাশুড়ীকে দিলেন। কেশব আমার রান্না খাইতে চিরকাল ভাল বাসিতেন। শাক তাঁর বড় প্রিয় ছিল, অড়হর ডালও বড় ভালবাসিতেন। আমায় বলিতেন, "মা, তুমি যে রকম করিয়া অড়হর ডাল রাঁধ, আমাকে তেমি করিয়া শিখাইয়া দাও।" আমার ছোট মেয়ে পান্নার ঘরের উপরকার ছাদে কেশবের একটী কুটীর ছিল। তিনি সেই কুটীরের মধ্যে নিজে রাঁধিয়া একদিন ভাইকে, একদিন বোন্‌দের, একদিন ছেলেদের খাওয়াইতেন। এইরূপে তিনি ভাই ভগ্নী এবং শিশু-সেবা করিতেন। কেশব ও কৃষ্ণবিহারী দুজনেই নবীনের ছেলে অমিকে বড় ভালবাসিতেন। বিবাহের পূর্ব্বে কেশব বলিয়াছিলেন, "আমার বিবাহ করিয়া দরকার নাই।" বিয়ের পর তাঁর মনে কি হইল, তারপর থেকেই তিনি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহিত মিশিতে লাগিলেন, এবং ক্রমে ক্রমে ব্রাহ্ম হইলেন। তাঁর ব্রাহ্ম হওয়ার দরুণ আমি অনেক ভুগিয়াছি, ভাশুরের নিকট অনেক গালাগালি খাইয়াছি, অনেক অত্যাচার সহ্য করিয়াছি, বিনা কান্নায় আমার দিন যায় নাই। আমি কেশবকে তাঁর ধর্ম্মের জন্য কিছুই বলিতাম না বলিয়া তিনি এক এক দিন রাগিয়া এত বকিতেন যে বলা যায় না। আমারও তখন এক

এক বার মনে হইত কেশব অন্যায় করিতেছেন, কিন্তু এখন আর সেই রূপ মনে হয় না।

ভাশুরপো মোহিন, যোগীন ও কেশবের এক সঙ্গে দীক্ষা হইবে সব ঠিক্, গুরু আসিয়াছেন, মহা ঘটা, কত লোক খ'াবে। ওমা, সকালে উঠিয়া দেখি, কেশব নাই, তিনি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাড়ীতে পলাইয়া গিয়াছেন! কেশব সমস্ত দিন এলেন না। আমি মনে করিলাম বুঝি খ্রীষ্টান হইতে গিয়াছেন। আমি অন্নজল ত্যাগ করিয়া পড়িয়া রহিলাম। রাত্রি দুপুরের সময় কেশব বাড়ীতে ফিরে এলেন, আমার জামাই যাদবের নিকট আমার অবস্থার বিষয় শুনিয়া তিনি চুপ করিয়া রহিলেন। তারপর আস্তে আস্তে আমার কাছে আসিয়া একখানি বই ও কাগজ আমার কোলের উপর দিয়া চলিয়া গেলেন। আমি পড়িতে লাগিলাম, প্রথমেই—

"তুমি কার কে তোমার
তুমি কারে বল রে আপন
মিছে মায়ায় নিদ্রাবশে
দেখেছ স্বপন।"

এই গানটী পড়িবার পর আমার মন একেবারে ভাল হইয়া গেল। সেই গানটী এখনও আমার মন হইতে যায় নাই। আমি উঠিয়াই সেই বই ও কাগজ লইয়া গুরুর নিকট গেলাম। তিনি সেই সব পড়িয়া

বলিলেন, "তোমার ছেলে যদি এই ধর্ম্ম নিতে পারে, সে একজন বড়লোক হবে, দেখ্‌বে তার কাছে কত লোক আসবে, তুমি এই জন্য কোনও দুঃখ করিও না।" গুরুর এই কথা শুনিয়া আমার মন একেবারে শান্ত হইয়া গেল।

আমার শ্বশুর মহাশয় কথায় কথায় "পর্য্যন্ত" বলিতেন। কেশবের জন্মের পর বলিয়াছিলেন (কেশবকে লক্ষ্য করিয়া), "এই পর্য্যন্ত আমার মতন হইবে। ইহাকে দিয়া তোমার খুব সুখ হইবে।" সুখ অবশ্য খুবই হইল, কিন্তু সে সুখ চোখের জলে পূর্ণ!

কেশবের যৌবনকাল ও প্রৌঢ়াবস্থার কথা অনেকে বলিয়াছেন, তাহা আর এখানে বলিবার দরকার নাই। তবে এই কথা বলি, তিনি যখন 'লিলিকটেজ' করেন এবং এখান থেকে চলিয়া যান তখন তাঁর ভাই বোন্‌দের প্রতি কিম্বা আমার প্রতি একটুও মায়া মমতা কমে নাই। 'লিলিকটেজে' যজ্ঞির (নিমন্ত্রণ) সময় অনেকবার বাবুরা বোধ হয় ভ্রম-ক্রমে কৃষ্ণবিহারীকে বাদ দিতেন, শেষে কেশব তাহা জানিতে পারিলে কাহাকেও কিছুই বলিতেন না বটে, কিন্তু মনে মনে বড় কষ্ট পাইতেন। এক দিন আমি তাঁহাকে বলিয়াছিলাম, "তোমার ছোট ভাই তোমার এখানে আসিলে তাহাকে তুমি ভাল করিয়া খাওয়াইবে।" সেই অবধি কৃষ্ণবিহারী তাঁহার কাছে

যখনই যাইতেন, তিনি নিজের খাবার হইতে কৃষ্ণবিহারীকে অর্দ্ধেক তুলিয়া খাওয়াইতেন। তিনি মাকে যে কত ভাল বাসিতেন তাহা তাঁহার শেষের ব্যামোতে প্রকাশ পাইয়াছে। তাঁর যখন খুব রোগ বাড়িত, আমি পাগলের মত তাঁর কাছে ছুটিয়া যাইতাম, তিনিও সব সময় মা মা করিতেন। বাবুরা কিন্তু সব সময় আমাকে তাঁর কাছে যাইতে দিতেন না। তাঁহারা বলিতেন, "ডাক্তার মানা করিয়াছেন; আপনি যদি তাঁর নিকট যান তাহা হইলে তাঁর ব্যামো বাড়িবে।" আমি বলিতাম, "আমার এই নিশ্বাসে কেশবের জন্ম, আমার রক্তে কেশবের দেহ, আমার নিশ্বাসে কখনও কেশবের অসুখ করিবে না, আমাকে তাঁর কাছে যেতে দাও।" আমি অনেক সময় তাঁর ঘরের পাশেই পড়িয়া থাকিতাম। কেশব এক এক বার জাগিয়া মা মা বলিয়া ডাকিয়া উঠিলে আমি ছুটিয়া যাইতাম। তিনি বলিতেন, "মা আমার কাছে বোস, আমায় কোলে ক'রে নিয়ে শুয়ে থাক।" একদিন তিনি রোগযন্ত্রণায় খুব অস্থির হইয়াছিলেন; আমি দুঃখ করিয়া বলিলাম, "কেশব আমি কি পাপ করিয়াছি জানি না, তাহাতেই বুঝি তুমি এত কষ্ট পাইতেছ।" এই কথা শুনিয়া সেই কষ্টের মধ্যেও তিনি বলিলেন, "না মা, তুমি আমার বড় ভাল মা, এ

রকম মা কে পায়, আমার যা কিছু ভাল সব তোমার কাছ থেকে পাইয়াছি।” এই বলিয়া আমার পায়ের ধূলা মাথায় নিলেন।

তিনি আমার হাতে দুধ খেতেন, তাঁর ভয় ছিল পাছে অন্য কেহ ঔষধের নাম করিয়া মাংসের জুস্ খাওয়াইয়া দেন। এক দিন কোনও এক প্রচারক, নাম করিব না—শিশির ভিতর জুস্ দিয়া ঔষধ বলিয়া আমার হাতে দিয়াছিলেন। কেশবের মুখে দিতেই তিনি তাহা ফেলিয়া দিলেন এবং বলিলেন, “মা তুমি আমাকে 'গু' খাওয়ালে?” তারপর থেকে আর কাহারও হাতে খেলেন না। খাওয়া একেবারে বন্ধ করিলেন। মেজ বৌএর ও মহারাণীর হাতে তিনি আগে খাইতেন; এই রকম দু'একবার জুস্ দেওয়াতে তাঁহাদের হাতেও খাওয়া বন্ধ করিয়াছিলেন।

কেশব খুব অসুখের সময় বলিতেন, “মা তুমি কি দেখ্‌তে পাচ্ছ না, আমি কার কোলে শুয়ে আছি। তুমি যেমন আমায় দুধ খাওয়াচ্ছিলে, তিনিও আমায় তেমি করে দুধ খাওয়াচ্ছেন।” এই ঘটনার দু'একদিন পরেই তিনি যান।*

---

* কেশবচন্দ্রের শেষ অবস্থা ও স্বর্গারোহণ সম্বন্ধে ৺ কৃষ্ণবিহারী বাবু যাহা লিখিয়াছিলেন তাহা (খ) পরিশিষ্টে দেখুন। যোঃ।

আদেশ ও দৃষ্টি।

১। আমি যখন কেশবের সঙ্গে নৈনীতাল দর্শনে যাই, সেই সময় একদিন হ্রদের সম্মুখে বসিয়া কেশবের সঙ্গে উপাসনা করিতেছিলাম। উপাসনা করিতে করিতে দেখিলাম, আমার সম্মুখে যাহা কিছু আছে সমস্ত রক্তেতে পূর্ণ হইয়া রহিয়াছে। আমি আশ্চর্য্য হইলাম, এবং কেশবকে জিজ্ঞাসা করিলাম, এইটী কি? তিনি বলিলেন, "মা, তুমি যাহা দেখিলে তাহা তোমার ভক্তির ভাব, কিন্তু আসল এখনও হয় নাই, সে পরে হইবে।" দেবালয়ে আমি অনেক সময় অনেক কথা পাইয়াছি, কিন্তু এখন আর কিছুই হয় না।

২। কেশবের যাওয়ার ২।৩ বৎসর পরে আমি দেখিলাম, কেশব পুকুরধারে—যেখানে তিনি মাটির নীচে যোগের জন্য কুটীর করিয়াছিলেন,—সেখানে একখানি গেরুয়া কাপড় গায়ে দিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। আমি তাঁহাকে ডাকিলাম এবং বলিলাম, "কেশব, ওখানে দাঁড়িয়ে কেন? এখানে এস।" তিনি বলিলেন, "আমি সেখানে যাব না, ওরা আমার কাছে আসুক।"

৩। আর একদিন দেবালয়ে উপাসনার সময় দেখিলাম, কেশব একটী ফুলের সাজি হাতে করিয়া বাগানে ফুলগাছ তলায় দাঁড়াইয়া আছেন, কিন্তু সাজিটী

শূন্য। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "তুমি ফুল তোল নি?" তিনি বলিলেন, "ফুল নাই, সব ফুল কলুটোলায় লইয়া গিয়াছে।" *

৪। আর একদিন, কেশব যাওয়ার দুই তিন দিন পরে, আমি বড় কাতর হইয়া 'লিলিকটেজে' ঘরের ভিতর দরজায় ঠেস্ দিয়া বসিয়া আছি, মেয়েরা সকলে চা খাইতেছিলেন, সেই সময় আমি দেখিলাম, কেশব আমার সম্মুখ দিয়া এ ঘর হইতে অন্য ঘরে হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেলেন।

৫। মোহিনীকে † এরূপ উপাসনার সময় অনেকবার দেখিয়াছি। এই সব সত্য কি কল্পনা জানি না; কিন্তু স্বপ্ন নয়, দেখিয়াছি ঠিক্। কিন্তু কৃষ্ণবিহারী যাওয়ার পর বিশেষ কিছু দেখি নাই, শুধু শেষবার যখন কাশী যাই, সিক্‌রোলে আমার বড় ব্যামো হইয়াছিল, সেই ব্যামোতে আমি বড় দুর্ব্বল হই, তাই আমার নাতি মণিকে ‡ বলিলাম, "আমাকে কাশী রাখিয়া এ আমি

* স্বর্গীয় কৃষ্ণবিহারী সেন তখন জীবিত ছিলেন। যোঃ।

† ইনি আমার মেজ জ্যেঠা প্রসিদ্ধ ডাক্তার অন্নদাচরণ খাস্তগীর মহাশয়ের দ্বিতীয়া কন্যা ও কেশবচন্দ্র সেনের জ্যেষ্ঠ পুত্র ৺ করুণাচন্দ্র সেনের পত্নী। ইনি সারদাসুন্দরীর জীবদ্দশায় মারা যান। তিনি অতি সুন্দরী, বিদূষী, ও ধার্ম্মিকা ছিলেন। যোঃ।

‡ ডাক্তার মোহিতলাল সেন, নবীন বাবুর তৃতীয় পুত্র।

কাশীতে মরিতে চাই।" এই বলিয়া মনের দুঃখে বসিয়া আছি, আমাকে একজন বলিলেন, "তোর কাশী সব যায়গা, এই কি তোর কাশী নয়? তুই যদি ষ্টেসনে মরিস্, সেখান থেকেও তোকে তুলে নিব।"

৬। কেশব যাওয়ার অল্পদিন পরে আর একদিন দেবালয়ে উপাসনা করিতেছি, এমন সময় কে আসিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুই কি চাস?" আমি বলিলাম, "মুক্তি চাই।" তিনি বলিলেন, "তবে তোর সন্তান সন্ততি কিছুই থাকিবে না।" এই কথা শুনিয়া আমার সমস্ত শরীর কাঁপিতে লাগিল। এই কথা আমি একবার ব্রহ্মব্রত সামধ্যায়ীকে কথায় কথায় বলিয়াছিলাম, তিনি বলিলেন, "মা, তুমি কেন এমন কথা বলিয়া ফেলিলে?" আমি বলিলাম, "কথা ত আমি বলি নাই, আমার জীবন বলিয়াছে, আমি কি করিব?" এখন বুঝিতেছি এইজন্য বুঝি আমার একে একে সব যাইতেছেন।

৭। তারপর আমার নবীন যে দিন গেলেন, তার পরদিন, পূর্ব্বে যাঁহাকে দেখিয়াছিলাম, তিনিই আবার আমায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "আর তুই আমায় ভালবাস্‌তে পারবি?" আমি তাহার কিছুই জবাব দিতে পারিলাম না। এই কথা কৃষ্ণবিহারীকে বলিলাম; তিনি বলিলেন, "মা, তোমায় তিনি ঠিকই জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, তুমি আর আমাদের কাহারও দিকে মন দিও না, শুধু যাঁহাকে

ধরিয়াছ তাঁহাকে এঁটে ধরিয়া বসিয়া থাক, আর কোনও দিকে যাইও না।" আমি পূর্ব্বে যাহা দেখিয়াছিলাম তাহাও কৃষ্ণবিহারী জানিতেন, ফুলেশ্বরী তাঁহাকে সব বলিয়া দিয়াছিল। সেই জন্য কৃষ্ণবিহারী মনে মনে জানিতেন—তিনিও থাকিবেন না।

কৃষ্ণবিহারী।

কেশবের আড়াই বছরের পর ফুলেশ্বরী, তার আড়াই বছরের পর চুনী এবং তার আড়াই বছরের পর পান্না; পান্নার আড়াই বছর পর এবং আমার ২৬ বছর বয়সে কৃষ্ণবিহারীর জন্ম হয়। এক অগ্রহায়ণে কৃষ্ণবিহারীর জন্ম হয়, ফিরে কার্ত্তিকে আমার স্বামী মারা যান। কৃষ্ণবিহারী ঐ নীচের গলিটায় হইয়াছিল। সেখানে একটী লম্বা ঘর ছিল, সেই ঘরের দরজায় কৃষ্ণবিহারীর জন্ম হয়* সেখানে বেহারী গুপ্ত, ওপিন্ ও অন্যান্য ছেলেরা হইয়াছিল। উপরকার যে ঘরে তোমার সুশান্ত ‡ হয় সেই ঘরে নরেন্দ্রের জন্ম হয়। মুরলীধর সেনের

* এই স্থানেই সারদা সুন্দরীর নির্দ্দেশ অনুসারে আমি একটী বেদি করিয়া দিয়াছি। যোঃ।

‡ আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র সুশান্তকুমার খাস্তগীর। যোঃ।



স্বর্গীয় কৃষ্ণবিহারী সেন

(জন্ম—৩রা ডিসেম্বর ১৮৪৭ মৃত্যু—

২৯এ মে ১৮৯৫)

এখন যেখানে রান্না হয়, তারই পাশে একটি চালা ছিল, সেইখানে মহারাণীর * জন্ম হয়। কৃষ্ণবিহারী ছোট বেলায় পিতৃহীন হইয়াছিল বলিয়া সকলেই তাঁহাকে ভালবাসিতেন, বিশেষ আমার ভাশুর কৃষ্ণবিহারীকে খুব ভালবাসিতেন এবং সব সময় তাঁহাকে কোলে কোলে রাখিতেন। যে খানে যেতেন সঙ্গে সঙ্গে নিতেন। পূজার সময় রাশি রাশি কাপড় দিতেন। রাত্রে কাঁদিলে নিজের কাছে তুলিয়া লইয়া যাইতেন ও শান্ত করিতেন। সকলের আদর পাইয়া কৃষ্ণবিহারী কি রকম দুরন্ত হইয়া গেলেন। দুরন্তপনা আর কাহারও সঙ্গে নয়, শুধু আমার সঙ্গে ও আমার বড় বৌএর সঙ্গে। ছেলেবেলায় পড়িতে চাহিতেন না, আমিও ছোট ছেলে বলে কিছুই বলিতাম না। শেষে নবীন এক দিন আমায় বকিলেন, "তুমি ওকে মূর্খ করবে।" সেই সময় তাঁকে ধরিয়া স্কুলে দেওয়া গেল, কিন্তু আশ্চর্য্য! সেই থেকে যে তার পড়ায় কি মন বসিল, তারপর থেকে আর স্কুল কামাই করেন নাই। কিম্বা পড়ায় অমনোযোগী হন্ নাই। কৃষ্ণবিহারী ছেলেবেলা হইতে খুব বুদ্ধিমান্ ছিলেন, স্কুলে যাওয়ার সময় হইতেই প্রথম প্রাইজ পাইতে আরম্ভ করিলেন। ঐ বাড়ীর গোল সিঁড়িতে

* কুচবিহারের মহারণী সুনীতি দেবী। যোঃ।

তেতলার ছাদে কেশব কৃষ্ণবিহারীকে লইয়া পড়িতেন, সেখানে আর কেহ যাইত না। কেশবের মত কৃষ্ণবিহারীর বৈষ্ণব ধর্ম্মে দীক্ষা হয় নাই, কিন্তু দুজনের পৈতা হইয়াছিল। পৈতা হওয়ার পর থেকে কেশব ধর্ম্মে (কুলধর্ম্মে) মেতে গেলেন, এক বৎসর একাদশী করিয়াছিলেন, ভাত খেতেন না।

নবীন ও কেশবের সময় এত পাস্ ছিল না; কিন্তু কৃষ্ণবিহারী একে একে সমস্ত পাস্ দিতে আরম্ভ করিলেন।* চারিদিকে তাঁর নাম বেরুতে লাগিল।

আমার ভাশুরপো ওপিন, কৃষ্ণবিহারী, ও রাজেশ্বরীর ছেলে বেহারীলাল গুপ্ত¶ (ইনিও আমাদের বাড়ীতে থাকিতেন) এই তিন জনে বড় বন্ধুত্ব ছিল। ইহাদের নাম ছিল উচ্ছে (কৃষ্ণবিহারী) আলু (বেহারী গুপ্ত) পটল (উপেন)। কৃষ্ণবিহারী যখন লেখা পড়া শিখে বিদ্বান্ হইলেন, তখন তাঁহার বিলাত যাওয়ার কথা হইল। সমস্ত ঠিক, কৃষ্ণবিহারীও নিজে প্রস্তুত, কিন্তু আমি দিলাম না। কৃষ্ণবিহারী বিলাত যাইবেন শুনে আমি মূর্চ্ছা গিয়াছিলাম। আমার অবস্থা দেখে কৃষ্ণবিহারী বিলাত যাওয়ার সংকল্প ত্যাগ করিলেন। আমার

* কৃষ্ণবিহারী বাবু এম্, এ পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চ স্থান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। যোঃ।

¶ সুপ্রসিদ্ধ সিভিলিয়ান বি, এল্ গুপ্ত। যোঃ।

জন্য কৃষ্ণবিহারীর সব গেল। চিরকালই তিনি আমার জন্য কষ্ট পাইয়াছেন। পূর্ব্বে বলিয়াছি, কৃষ্ণবিহারী আমার সঙ্গে সব সময় আব্দার করিতেন। আমাকে রাগাবার জন্য বলিতেন, "আমি টেবিলে বসে খানা খাব আর ঢগ্ ঢগ্ ক'রে মদ ঢালব আর খাব।" এ শুনে আমি ভয় পেতাম। আমি এত ভয় করিতাম যে তিনি যে দিন ঠাকুরদের বাড়ী কিম্বা অন্যস্থানে যাইতেন, সেখান থেকে ফিরে এলে, যখন ঘুমাইতেন, আমি তাঁর মুখ শুঁকে দেখ্‌তাম যে সত্যি মদ খাইয়াছেন কি না। কিন্তু ছেলেবেলা হইতে আমার ছেলেদের এত মনের বল ছিল যে, কত রকম লোকের সঙ্গে মিশেও এক দিনের জন্য ভ্রমেও কুপথগামী হন নাই। এই বিষয়ে আমি চিরকাল সুখী। একটা পাস্ বাকী থাকিতে কৃষ্ণবিহারীর বিয়ে দিলাম, সে বিয়ে এক নূতন রকম। কৃষ্ণবিহারীর অনেক বড় বড় ঘর থেকে সম্বন্ধ আসে, কিন্তু আমি একটী মেয়ে ঠিক করি। তারপর যখন কৃষ্ণবিহারীকে বিয়ের কথা বলি, তখন কৃষ্ণবিহারী বলিলেন, "মা বিয়ে আবার লোকের কটা হয়?" আমি বলিলাম, "তোর আবার বিয়ে হইল কখন?" কৃষ্ণবিহারী এই কথা শুনে বলিলেন, "আমি পটলডাঙ্গার তারক সেনের বড় মেয়েকে মনে মনে বিয়ে করিয়াছি।"

ভাশুর ঐ মেয়ের পিতার কুলের বিষয় লইয়া বিবাহে

ভয়ানক অমত করিলেন, কেন না তাঁহারা কুলে আমাদের চেয়ে ছোট ছিলেন। শেষে আমি এই বিবাহের জন্য অনেক সাধ্য সাধনা করাতে মত দিলেন। আমাদের নিচু বাগানের বাগান-বাড়ীতে কৃষ্ণবিহারীর বিবাহ হয়। কৃষ্ণবিহারী চিরকালই গরিব ছিলেন, বিয়েও গরিবের মতন হইল। শেষে বৌ যখন এলেন এবং সেই বৌ লইয়া যখন ভাশুরকে দেখান গেল, তখন তিনি বৌ দেখিয়া বলিলেন, "এমন সুন্দর বৌ আমাদের বাড়ীতে একটীও হয় নাই।" বিয়ের পর আমি নিজে কৃষ্ণবিহারীর বৌকে লইয়া গিয়া মন্দিরে কেশবের নিকট দীক্ষিত করাই। সেই সঙ্গে আনন্দ-মোহন বসু ও তাঁর স্ত্রী এবং গোপাল রায়, আরও কে কে দীক্ষিত হন।

দীক্ষার পর কৃষ্ণবিহারী একেবারে মাটির মানুষ হইয়া গেলেন। কৃষ্ণবিহারীর পড়ার উপর চিরকাল ঝোঁক ছিল, সব সময় বই সঙ্গে সঙ্গে থাকিত। তিনি ঐ বারাণ্ডায় স্কুল করিয়াছিলেন। তাহাতে বাড়ীর বৌদের পড়াইতেন। বৌরা এক এক সময় ঠাট্টা করিতেন যে, "তোমাকে আমরা হাতে করে মানুষ করিলাম, আবার তোমার কাছে পড়িব!" আবার বৌরা তাঁকে সব সময় মাষ্টার মাষ্টার বলিয়া ডাকিতেন।

আমার ভাশুর কৃষ্ণবিহারীকে খুব স্নেহ করিতেন। তিনি আমার দেবর মুরলীধর সেনকে লিখিয়া গিয়াছিলেন যে তিনি কৃষ্ণবিহারীর, গোবিন্দবাবুর ও মুরলীধরের টাকা ধারেন, কিন্তু কৃষ্ণবিহারী চিরদুঃখী—কিছু পায় নাই, সুতরাং কৃষ্ণবিহারীর টাকা আগে দিয়া তারপর যেন তাঁহারা দু'জনে টাকা লন। সেই কাগজ মুরলীধর নিজের কাছে রাখিয়া দিয়াছিলেন, পরে তমাদি হইলে সেই কাগজ কৃষ্ণবিহারীকে দেন। কৃষ্ণবিহারী একটী কথাও বলিলেন না। চিরকাল যেমন নীরবে সহ্য করিয়া ছিলেন, তখনও সহ্য করিলেন। মুরলীধরের মৃত্যুর পর কৃষ্ণবিহারীর যে কি কষ্ট হইয়াছিল তাহা বলা যায় না, ছেলে মানুষের মত খুড়ার জন্য কাঁদিয়াছিলেন। খুড়ারও মৃত্যুশয্যায় অনবরত "কৃষ্ণবিহারী, কৃষ্ণবিহারী" ছাড়া আর কোনও কথা ছিল না।

কৃষ্ণবিহারী চিরকালই কেশবের অনুগত ছিলেন, দীক্ষিত হওয়ার পর "ছোট দাদা, ছোট দাদা" বলে ক্ষেপিয়া গেলেন, কৃষ্ণবিহারীর জয়পুরে বেশ বড় কাজ হইয়াছিল, কিন্তু তিনি বড় স্বাধীন প্রকৃতির লোক ছিলেন বলিয়া সেই কাজ করিতে পারিলেন না। রাজার কাছে রোজ গিয়া বসিয়া থাকাটা তাঁর ভাল লাগিল না।

নবীন খুব তেজী ছিলেন, কিন্তু কেশব আর কৃষ্ণবিহারী ছোটবেলা থেকে বড় অভিমানী ছিলেন। কেশবের ছোটবেলাকার আর দুই একটী কথা মনে হইল। আমি কখনও কখনও কেশবকে বলিতাম, "তোমার জ্যেঠার কাছ থেকে টাকা চেয়ে নিয়ে এস।" তিনি কিছুতেই টাকা চাহিবার জন্য যাইতে চাহিতেন না। অনেক বলার পর যদি বা যাইতেন ত ঐ সিঁড়ির কাছটীতে চুপ্ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতেন। আমাকে বলিতেন, "মা আমি গিয়া টাকা চাইব, তিনি বল্‌বেন—"কশবা" তা আমি পার্‌ব না।" এই অভিমানের জন্য দুই ভাই-ই জীবনে অনেক ভুগিয়াছেন। কেহ তাঁহাদের নিজের উপর অন্যায় অত্যাচার করিলে তাঁহারা একেবারে গম্ভীর হইয়া চুপ্ করিয়া থাকিতেন। আপনার পক্ষে একটী কথাও বলিতেন না। এই জন্য কেশব ছেলেবেলায় আর একবার ভুগিয়াছিলেন। ছোটবেলায় যখন পড়িতেন, সেই সময় আর একটা ছেলে কেশবের কাছ থেকে কি একটা জানিবার জন্য জিদ্ করিতেছিল। মাষ্টার টের পান। কিন্তু যে ছেলে জিজ্ঞাসা করিতেছিল সে বেশ চেপে গেল, কেশবকেই মাষ্টার দোষী মনে করিলেন। ইহাতে কেশবের অভিমান হইল—তিনি একটী কথাও বলিলেন না। নিজে শাস্তি লইলেন তবুও নিজে যে নির্দ্দোষী তাহা

একটীবার বলিলেন না।* কৃষ্ণবিহারী কেশবের কথামত জয়পুরের কাজ ছাড়িয়া দিয়া এল্‌বার্ট স্কুলে গেলেন। ‡ তাঁর জয়পুরের চাকুরী ছাড়িবার আর একটী উদ্দেশ্য যে কেশবের সঙ্গে সব সময় থাকা। ভাইকে এমন ভালবাসিতে কেউ পারে না। রাম লক্ষ্মণ ছাড়া এমন ভালবাসার কথা শুনি নাই। লক্ষ্মণ যেমন ভাইএর সঙ্গে সমুদায় সুখ সম্পদ ছাড়িয়া বনবাসী হইলেন, আমার কৃষ্ণবিহারীও সেই রকম ভাইএর সঙ্গে সঙ্গে এ সোণার সংসার থেকে বেরিয়ে এসে ধর্ম্মের জন্য জীবন উৎসর্গ করিলেন। যখন

* এইটীই সেই ঘটনা, যাহা লইয়া অনেকে এখন কেশবকে দোষারোপ করিতেছেন। যোঃ।

‡ এই এল্‌বার্ট কলেজ লইয়া শেষে কৃষ্ণবিহারী বাবু অতি বিব্রত হইয়া পড়েন। ক্রমে ক্রমে সকলে এল্‌বার্ট কলেজের বিষয়ে উদাসীন হন। কেশবের কাজ বলিয়া কৃষ্ণবিহারী বাবু মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তাহা ত্যাগ করিতে পারিলেন না। নিজের অসুস্থতার জন্য স্কুলের ছাত্র-সংখ্যা কমিয়া গেল। এ দিকে কলেজের জন্য বিলাত হইতে laboratory সংক্রান্ত অনেক যন্ত্রাদি আনিতে গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক বাধ্য হইলেন। সুতরাং পৈত্রিক টাকার যাহা কিছু অবশিষ্ট ছিল, সেই কয়েক সহস্র টাকাও কলেজের জন্য দিতে হয়। তিনি নিজে এই জন্য একেবারে নিঃসম্বল হন। শেষ অবস্থায় বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য স্থানান্তরে গমন করিবার টাকাও তাঁহার ছিল না; এই জন্যই তিনি অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হন। যোঃ।

আমাদের বাড়ী ভাগ হয় তখন কৃষ্ণবিহারী তাঁর এই বাড়ীটী অতি সুন্দর করিয়া মেরামত করিয়া, নূতন নূতন জিনিষ দিয়া ঘর সাজাইয়া একদিন ছোট বৌকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বল দেখি এ ঘর কেন সাজাইলাম ?" বৌ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি জন্য সাজাইলে ?" কৃষ্ণবিহারী বলিলেন, "ছোট দাদা এসে যখন বাড়ী দেখিবেন—বলিবেন, 'বাঃ কৃষ্ণবিহারী বেশ সুন্দর বাড়ী করিয়াছে'।" কৃষ্ণবিহারী ভাইকে এত ভালবাসিতেন যে ভাইএর মুখে ঐ "বেশ" কথাটী শুনিবার জন্য তিনি বাড়ীঘর সাজাইলেন। গাড়ী ঘোড়াও কিনিয়াছিলেন—রোজ ভাইকে দেখিবার জন্য। কৃষ্ণবিহারী কেশবের ভিতরই তাঁর ধর্ম্ম-কর্ম্ম সার করিয়াছিলেন। তাঁর তীর্থসঙ্গীতের * এই গানটী তিনি গাহিতেন এবং এইটী তাঁর সাধনের অঙ্গ—

"কিবা চাব হরি, করযোড় করি,
এই মিনতি করি তোমার দুয়ারে,

* কৃষ্ণবিহারী বাবু ও তাঁহার কয়েকটী ধর্ম্মবন্ধু কেশবের মৃত্যুর পর প্রতি রবিবার একটী বাগানে একত্র হইয়া সমস্ত দিন ধ্যান ধারণা এবং কেশব-প্রসঙ্গে ও কেশব-চরিত্র অধ্যয়নে অতিবাহিত করিতেন। কৃষ্ণবিহারী বাবু যে উপাসনা করিতেন, তাহা অবলম্বনে গান প্রস্তুত হইত। সেই সমস্ত গান তীর্থ-সঙ্গীত রূপে পরে মুদ্রিত হয়। আমিও কয়েক বার এই বাগানে গিয়াছিলাম। যোঃ।

কেশব চরিত, পবিত্র শোণিত,
কর প্রবাহিত হৃদয় মাঝারে।
এ পাপনয়ন অন্ধ হয়ে যাবে,
কেশব-নয়ন ললাটে বসিবে,
কেশব-নয়নে, আনন্দিত মনে,
দিবস রজনী হেরিব তোমারে।
এই কর্ণ মোর বধির হইবে,
কেশব-কর্ণ আসি এ কর্ণে বসিবে,
শুনিব তোমার সুমধুর স্বর,
আমি নিরন্তর অন্তর বাহিরে।"

ভাই ভাই ক'রে তিনি জীবন দিলেন। একে ছোটবেলা থেকে তাঁর শরীর খারাপ, তার উপর কেশবের কাগজের দরুণ অনবরত রাত জেগে পরিশ্রম করা, এদিকে তোমাদের ব্রাহ্মসমাজ থেকে গালাগালি, এই সব নানা কারণে এবং নবীন ও কেশবের শোকে তাঁর শরীর একেবারে ভাঙ্গিয়া গেল। আমার এমন ছেলের প্রতি, কি ঘরের কি বাহিরের কেহ ভাল ব্যবহার করিলেন না। এক এক দিন কৃষ্ণবিহারীর কষ্টে আমার বড় যন্ত্রণা হইত। আমি বলিতাম, "তুমি আর কোনও কাজ করিও না এবং কোনও কথায় থেকো না। যদি এসব কর, তাহা হইলে আমি তোমার সঙ্গে কথা কহিব

না।” কৃষ্ণবিহারী আমার এ কথা শুনিয়া বলিতেন, “মা আমি কি পৃথিবীর অপমানের ভয়ে ছোটদাদার কাজ ছাড়িয়া দিব? আমাকে যদি হাজার রকমে অপমান করে তবুও আমি প্রাণ থাকিতে ছোটদাদার কাজ ছাড়িব না, আমাকে যত রকম অত্যাচার আছে করুক, তবুও ছোটদাদার কাজ আমি ছাড়িব না।” কৃষ্ণবিহারী যে বুদ্ধের বিষয় লিখিয়াছিলেন, তিনি নিজেও যাইবার আগে একেবারে তেমনি নিষ্কাম হইয়া গিয়াছিলেন। কোনও বিষয় ভাবিতেন না। জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন, “মা, আমি কিছু না ভেবে আছি, কিছুই ভাব্‌ছি না।” কৃষ্ণবিহারী একেবারে নিষ্কাম হইয়া গিয়াছিলেন, মৃত্যুর জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত ছিলেন। সংসারের কোনও কথা বলিতে গেলে চুপ্‌টী করে থাকিতেন। ইংরাজী খুবই জানিতেন। ফরাসী ও পালিভাষায় বেশ বিদ্বান্‌ ছিলেন। তিনি ফরাসী ও পালিভাষা থেকে যত ভাল ভাল বিষয় পড়িয়া আমাদের সকলকে শুনাইতেন। শেষে যাইবার কিছুদিন আগে জর্ম্মানির ভাষা শিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। তাঁর বিশ্বাস ছিল, জর্ম্মানির ভাষা তিনি শেষ করিতে পারিবেন না। তার আগেই তাঁর মৃত্যু হইল। মহারাণী যে বড় দূরবিণ্‌ দিয়াছিলেন, সেই দূরবিণ্‌ লইয়া তিনি কত রাত্রি পর্য্যন্ত ছাদে বসিয়া থাকিতেন। কোন্‌ দিন,

কোন্ নক্ষত্র কোথায় থাকিবে, আগে অঙ্ক করে দেখিতেন, তারপর আমাদের বুঝাইয়া দিয়া শেষে তাহা দুরবিণ্ দিয়া দেখাইতেন। ধনীলোকেরা যেমন বৎসরের টাকা পয়সার হিসাব করেন, কৃষ্ণবিহারীও সেই রকম বৎসরে কত নূতন নূতন বই পড়িবেন, আগে থেকে তাহার হিসাব রাখিতেন। হিসাবের সঙ্গে সঙ্গে মাঝে মাঝে মিলাইয়া দেখিতেন। এই রকমে তিনি নানা দেশের নানা ভাষার বই পড়িতেন; এই রূপে প্রতি বৎসর তিনি অনেক ভাষার ১০০।১৫০ নূতন নূতন বই পড়িতেন। দীনবাবু, রামেশ্বর, মুক্তেশ্বর ও রাজমোহন, অনেক রাত পর্য্যন্ত তাঁর সঙ্গে নানা রকম ভাল ভাল কথা বলিতেন। দীনবাবু ও মুক্তেশ্বর কৃষ্ণ-বিহারীর আগেই যান। এই কয়জন তাঁর শেষ সময়ের বন্ধু ও ইঁহারা সকলেই কেশবের পরম ভক্ত ছিলেন। জ্যোতি ঠাকুরের সঙ্গে কৃষ্ণবিহারীর খুব বন্ধুত্ব ছিল। দুই জনে ভাইএর মতন ছিলেন। কৃষ্ণবিহারীর ভালবাসা বাহিরে প্রকাশ পাইত না। কত লোককে যে মাসে মাসে লুকিয়ে দান করিতেন, তাহা কেহ জানিত না, শুধু নরেশ জানিত, কারণ, নরেশের কাছেই টাকা থাকিত। দানের ভিতরে ছোট বেলায় যাঁহাদের সঙ্গে পড়িতেন, তাঁহারাও অনেক ছিলেন। নরেশ চিরকাল তার ছোট মামাকে দেবতার মত জানে।

পান্না যাওয়ার পর কৃষ্ণবিহারী বড় কাঁদিয়াছিলেন। পান্না যাওয়ার এক বৎসর পর কৃষ্ণবিহারী গেলেন। শেষে যখন তিনি বুঝিতে পারিলেন যে তাঁর যাওয়ার সময় হইয়াছে, তখন আমি যদি তাঁর কাছে কখনও যাইতাম, তিনি আমার দিকে তাকাইতেন না, কথা কহিতেন না, চোক বুঁজে পড়ে থাকতেন। তাঁর যাওয়ার পর মহারাণী ও মহারাজা কৃষ্ণবিহারীর পরিবারের খুবই উপকার করিয়াছেন।

এখন আমার শোক-তাপের সময়, কৃষ্ণবিহারীর কত যে গুণ ছিল তাহা আর আমি বলিতে পারিতেছি না, ভাল মনেও আস্‌ছেনা। তবে উমানাথ যে কৃষ্ণবিহারীর যাওয়ার পর শ্রাদ্ধের সময় একটী বই লিখিয়াছিলেন, সেইটী পরে আমাকে কে একজন পড়িয়া শুনাইয়াছিল। তাহাতে উমানাথ লিখিয়াছিলেন যে, কৃষ্ণবিহারী সকল বিষয়েই কেশবের ছোট ভাই। উমানাথ কৃষ্ণবিহারীকে ঠিক্‌ই বুঝিয়াছেন। কৃষ্ণবিহারী বাস্তবিকই কেশবের ছোট ভাই।*

---

* 'গ' পরিশিষ্ট দেখুন। কৃষ্ণবিহারী বাবুর মৃত্যুর পর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কন্‌ভোকেশনের সময়ে স্যার আল্‌ফ্রেড্‌ ক্রফ্‌ট্‌ ও কৃষ্ণবিহারী বাবু সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিলেন 'ঘ' পরিশিষ্টে দেখুন। যোঃ।

মহারাণী সুনীতি।

মহারাণী সুনীতি কেশবের বড় কন্যা। মহারাণী যখন আঁতুড়ে তখন ভয়ানক ঝড় হয়। মহারাণী ছেলেবেলা থেকে বেশ ভাল ছিলেন। পড়া শুনা করিতে ভালবাসিতেন। তিনি কাহারও সঙ্গে ঝগড়া করিতেন না, সকলের সঙ্গে ভাব রাখিতেন। ছেলেবেলা থেকে তাঁর দয়ার ভাব বেশী ছিল। গরিব দেখিলেই দান করিতেন। ছেলেবেলা থেকেই বেশ ধর্ম্ম-কর্ম্মে মন ছিল। কেশবের কুটীরের কথা যে তোমাকে বলিয়াছি, সেই কুটীরে কেশব যখন রাঁধিতে রাঁধিতে পাঠ করিতেন, সুনীতি সেই সময় তাঁর কাছে বসিয়া শুনিতেন। কেশবের খাওয়া হইয়া গেলে মহারাণী তাঁর পাতের প্রসাদ প্রায় খেতেন। মহারাজাও কেশবকে এত ভক্তি করিতেন যে এক দিন কেশব খেয়ে উঠে গেলে তাঁহার পাতে খাইতে বসিলেন।

কুচবিহারের বিবাহ।

যাদব চক্রবর্ত্তী বিয়ের সম্বন্ধ আনেন। কেশ[illegible] রাজাকে দেখিতে চাহিলেন, দেখ্‌লেন; কি বি[illegible]

কথাবার্ত্তা হইল, তাহা আমি ঠিক্ জানি না। আর একদিন যখন রাজা একলা এলেন, সেদিন রাজা, সুনীতি আর আমি ছিলাম। রাজা মহারাণীকে পড়া শুনার কথা জিজ্ঞাসা করিয়া চলিয়া গেলেন। তারপর বিয়ের ঠিক্ঠাক্ এবং গোলযোগ আরম্ভ হইল। বিবাহের ঠিক্ হইলে জুড়ুনি এল। কলুটোলার বাড়ী-তেই জুড়ুনি এল। কেশব এর আগে কলুটোলার বাড়ী হইতে যাইয়া নারিকেলডাঙ্গায় বাড়ী করিয়া-ছিলেন। কেশব বলিয়াছিলেন, "জুড়ুনি আমার মার নিকট হইবে।" জুড়ুনি দেওয়ার কিছুদিন পর আমরা কুচবিহার যাত্রা করিলাম। আমি, ফুলেশ্বরী, কৃষ্ণবিহারী ও কৃষ্ণবিহারীর ছেলে কুমুদ, নবীনের দুই ছেলে, সেজ মেয়ের ছেলে নরেশ ও সুরেশ, ফুলেশ্বরীর ছেলে হেম, সূর্যি ও ব্রজ; নরেন্দ্র * ও তাঁর ছেলে সত্যেন্দ্র, আমরা এই কয়জন কলুটোলা হইতে গেলাম। মহারাণী ও কেশবের পরিবার আমার সঙ্গে ছিলেন। আমরা কুচ-বিহারে পৌঁছিলে আমাদের থাকিবার জন্য দুইটী বাড়ী দেওয়া হইল, একটীতে মেয়েরা এবং অপরটীতে পুরুষেরা থাকিতেন। গায়ে হলুদ হইয়া গেল। তখন মাহারাণীর বয়স্ তের বৎসর ছয় মাস। খুব ঘটা হইল। অধিবাসের দিন সকালে আমরা খেয়ে দেয়ে বিয়ে-

* রায় ৺নরেন্দ্রনাথ সেন বাহাদুর। যোঃ।

বাড়ীতে গেলাম। বিয়ের জন্য একটী আলাদা বাড়ী ছিল। সেইদিন রাত্রে সেইখানে রহিলাম। তারপর দিন বিয়ে। মহারাজার নান্দীমুখের যোগাড় হইল, সারি সারি সিন্দূর মাখান মাছ সেখানে রাখা হইয়াছে দেখিলাম। মহারাণী বরাবর আমার সঙ্গে ছিলেন। নান্দীমুখ মহারাজা করিয়াছিলেন কি না আমি জানি না। কিন্তু সুনীতি করে নাই, সে আমার আঁচল ধরিয়া সমস্তক্ষণ বসিয়াছিল, আমাকে স্নান করিতে পর্য্যন্ত দেয় নাই। সে ভয়েতে জড় সড় হইয়া বলিতে লাগিল, "ঠাকুরমা, তুমি আমার কাছে থাক, এরা নিশ্চয় আমাকে কি করিবে।" আমি রহিলাম। নান্দীমুখের কাছে তাঁহাকে লইয়া গেল। রাজার ঠাকুর-মা এলেন, এসে পুরোহিতকে ডাকিলেন। তিনি পুরোহিতকে ডাকিতেই আমি বলিলাম, "পুরুত এখানে এসে কি করিবে?" তিনি একটী মোহর দেখাইয়া বলিলেন, "এই মোহরটী আর ঐ জল, তুলসী ইত্যাদি কতকগুলি জিনিষ পুরোহিতের হাতে কনেকে দিতে হইবে।" এই বলে তিনি সে সব রাণীর হাতে তুলে দিলেন। আমি তৎক্ষণাৎ সে সমস্ত রাণীর হাত থেকে লইয়া ফেলিয়া দিলাম। আমি বলিলাম, "তোমাদের ওকি নিয়ম? এ সব কুলক্ষণ করিতে নাই, ইহাতে তোমাদেরও অমঙ্গল আমাদেরও অমঙ্গল। আমি এ সব বলাতে তিনি বুঝিলেন এবং

বল্লেন, "আচ্ছা থাক্," কিন্তু রাণীকে বলিলেন, "তুমি মোহরটী পুরোহিতকে দাও, আমি মোহর দিতে দিলাম না, বলিলাম আপনিই দিন। কিন্তু তিনি শুনিলেন না, নিজেই মোহরটী সুনীতির হাতে ছোঁয়াইয়া পুরোহিতকে দিলেন। তার পর আর কিছু হয় নাই, আমি বাড়ী গেলাম। খেয়ে দেয়ে বিকেলে এলাম। রাত্রে বিয়েতে বড় গোল, সে সব কথা অনেকে বলিয়াছেন, আর বলিবার দরকার নাই।

কেশবের মত কেশব উপাসনা করিয়া রাজারাণীর বিবাহ দিলেন। রাজাকে এনে ওরা আবার হোম ইত্যাদি করিয়াছিল, যদি রাজা হোমটী না করিতেন, তবে এইটীকে খাঁটী ব্রাহ্মবিবাহ বলা যাইতে পারিত।

ব্রাহ্মমতে বিবাহ হইয়া যাইবার পরেই রাণীকে তুলিয়া আনা হইয়াছিল। বিবাহের পর রাজা যে হোম করিয়াছিলেন, রাণী তাহাতে একেবারে যোগ দেন নাই। আমরা বিয়ের দুই দিন পরেই রাণীকে লইয়া কলিকাতায় চলিয়া আসি। কলিকাতায় আসার পর চারিদিক হইতে কেশবের উপর অত্যাচার আরম্ভ হইল। আমরা যে দিন এখানে আসি, তার পরদিনই মহারাজা বিলাত চলিয়া গেলেন। রাণীর সঙ্গে আর দেখা হয় নাই। এই বিবাহের জন্য কেশব যাহা সহ্য করিয়াছেন, লোকে তাহা

পারে না। যে উদ্দেশ্যে কেশব এত সহ্য করিলেন, কুচবিহার রাজ্যে তাহা পূর্ণ হোক্।

বৌরা।

বৌরা সব ভাল। আমার সন্তানেরা সব ভাল ছিলেন; বৌরা পরের মেয়ে, আমার ছেলেদের সঙ্গে একত্র হইয়া তাঁহাদের গুণে সমস্ত ভাল হইয়া গেলেন। আমার যে ছেলের যে গুণ ছিল, বৌরা ক্রমে ক্রমে সেই সব গুণের অংশ পাইয়াছিলেন।

প্রচারক।

প্রচারক হইয়া যখন বাবুরা আসিতে লাগিলেন, আমি মনে করিতাম, ইঁহারা দেবতা না আর কি? মনে হইত, ইঁহারা সব মা বাপ ছাড়িয়া ধর্ম্মের জন্য প্রাণ দিতে আসিয়াছেন, ইঁহাদের যাহাতে ধর্ম্মের পথে ভাল হয় আমার তাই করা উচিত। আমি প্রচারকদের লুকিয়ে লুকিয়ে অনেক সময় ভাত রাঁধিয়া দিতাম। আমি ইঁহাদের চিরকালই

ছেলের মতন দেখিয়া আসিতেছি। ইঁহাদের ঝগড়া-ঝাটি দেখিয়া মনে হয়, ছেলেরা নিজেদের ভিতর সামান্য তুচ্ছ বিষয় লইয়া ঝগড়া করিতেছেন। আমি মা, তাহাতে আমার মায়া কি স্নেহ কিছু মাত্র কমে নাই। তাঁহারাও বোধ হয় আমাকে মার মতন দেখেন। বিজয় ও শিবনাথ কেশবকে ছাড়িয়া গেলেন বলিয়া আমার মনে তাহাদের প্রতি কখনও অন্য ভাব আসে নাই।

নাত্‌বৌরা।

কৃষ্ণবিহারীর ছেলে কুমুদের * বিবাহেতে এবং প্রফুল্লের বিবাহেতে আমার মনে প্রথম বড় কষ্ট হইয়াছিল, কিন্তু যখন বিবাহ হইয়া গেল এবং বৌরা ঘরে আসিল, তখন ক্রমে ক্রমে বৌদের গুণ দেখিয়া আমি মোহিত হইয়া গেলাম। প্রফুল্লের বৌ ও কুমুদের বৌকে আমি জাতের বৌএর চেয়ে কিছু

---

* ৺ কৃষ্ণবিহারী বাবুর জ্যেষ্ঠ পুত্র কুমুদবিহারী সেন প্রসিদ্ধ সিভিলিয়ান রমেশচন্দ্র দত্তের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ৺ যোগেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের মেজ মেয়ে ৺ সরযূবালাকে বিবাহ করেন। কেশবচন্দ্র সেনের সেজ ছেলে ব্যারিষ্টার মিঃ প্রফুল্লচন্দ্র সেন মিস্ রাইস্‌কে বিবাহ করেন। যোঃ।

কম ভালবাসি না। মোহিনী সুকোর * চেয়ে বয়সে বড় ছিল। সেইজন্য মেজ বৌএর অমত হইলেও আমি কিছু ভাবি নাই। মোহিনীর গুণে ও ধর্ম্মভাবে তাহাকে সকলেই ভালবাসিত, কিন্তু অল্প দিনের ভিতর কুমুদের বৌ সরযূর, পূর্ব্বে ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে কিংবা ধর্ম্মের সঙ্গে কোনও সম্পর্ক না রাখিয়াও, কি করিয়া ধর্ম্মে এত মতি হইল ইহাই আশ্চর্য্য। মোহিনী কিম্বা সরযূর মুখে আমি কখন কাহারও নিন্দা শুনি নাই। মোহিনী কেশবকে সাক্ষাৎ দেবতার মতন দেখিতেন, সেই জন্য তাহার একান্ত ইচ্ছা ছিল যে, কেশবের পরিবারের সঙ্গে এক হয়, তাহার যে সম্বন্ধ এসেছিল, § সেখানে বিবাহ করিলে

* ৺ করুণাচন্দ্র সেনকে পরিবারস্থ লোকেরা "সুকো" বলিয়া ডাকিতেন। যোঃ।

§ লাহোরের প্রসিদ্ধ সরদার ৺ দয়াল সিং মোহিনী দেবীকে প্রথমে বোম্বাই সহরে ডাঃ আত্মারাম পাণ্ডুরাম মহাশয়ের বাড়ীতে দেখেন। তার পর হইতে তাঁহার গুণগ্রামের বিষয় অবগত হইয়া বিবাহের জন্য অতিশয় আগ্রহ প্রকাশ করেন এবং কলিকাতার অনেক প্রসিদ্ধ লোক দ্বারা অনেক দিন পর্য্যন্ত চেষ্টা করেন। যাঁহারা এই বিবাহের জন্য চেষ্টা করেন, তাঁহাদের ভিতর ৺ প্রতাপচন্দ্র মজুমদার ও আমার যতদূর মনে হয়, মিঃ সুরেন্দ্রনাথ বান্যার্জ্জিও ছিলেন। কিন্তু মোহিনী দেবী কোন মতে এই বিবাহ-প্রস্তাবে মত দিলেন না। যোঃ।

সে রাজসুখে থাকিতে পারিত; কিন্তু মোহিনী তাহা তুচ্ছ করিয়া কেশবের সঙ্গে এক হইল। এই বিবাহে মোহিনীর বাবা, প্রতাপ প্রভৃতি সকলের অমত ছিল। কিন্তু মোহিনীর কেশবের প্রতি ভক্তি ও মোহিনীকে করুণার একান্ত বিবাহ করিবার ইচ্ছা দেখিয়া আমি, কেশব ও মহারাণী এই বিবাহ দিই। মোহিনীকে আমি খুবই ভালবাসিতাম বলিয়াই তোমার সঙ্গে সরলার * বিবাহও আমি দিই।

রামকৃষ্ণ পরমহংস।

রামকৃষ্ণ পরমহংস মহাশয় একদিন আদিসমাজ দেখিতে গিয়াছিলেন। সেখানে তিনজন উপাসনা করিতেছিলেন। পরমহংস উপাসনার পর বলিলেন, "এই তিন জনের ভিতর এক জনকে দেখে বুঝিতে পারিলাম ইঁহারই হইয়াছে। তারপর তিনি কেশবের সঙ্গে ভাব করেন। তারপর থেকে আমাদের বাড়ীতে আসিতেন, ঐ তেতলার ঘরে প্রথম আমি তাঁহাকে দেখি। কেশবের কাছে এসে তিনি কেশবের হাত ধরে নাচিতেন ও গান গাহিতেন।

* ৺ কৃষ্ণবিহারী সেন মহাশয়ের প্রথমা কন্যা। যোঃ।

আর একদিন কমলকুটীরে মাঘোৎসবের সময় বরণের দিন, সংকীর্ত্তনের পর আমি বলিলাম, "আপনি কিছু খান।" তিনি খানিকক্ষণ ভাবিয়া বলিলেন, "হাঁ; মা বলিয়া দিয়াছিলেন, কেশবের বাড়ী থেকে এক খানি জিলিপী খেয়ে আসিস্।" আমি এক খানি জিলিপি দিলাম, তিনি হাত কাত্ করিয়া লইয়া খাইলেন (তিনি হাত সোজা করিতে পারিতেন না)। তারপর যখন চলিয়া যান, কেশবকে বলিলেন, "দেখ কেশব, আমি যখন আসি, মা বলিয়াছিলেন 'কেশবের বাড়ীতে যাইতেছ, একটি কুল্‌পী বরফ খেয়ে এসো।" তখন সেখানে কুল্‌পিওয়ালা ছিল না, কেশব কুল্‌পী কোথায় পান ভাবিতেছেন, এমন সময় হঠাৎ একজন কুল্‌পীওয়ালা আসিল; একটি, কুল্‌পী কেশব দিলেন, তিনি খুব আহ্লাদ করিয়া খাইলেন। সেই বরণের দিন সংকীর্ত্তনের সময় কেশব ও পরমহংস অনেকক্ষণ হাত ধরাধরি করিয়া নাচিলেন। কীর্ত্তন শেষ হইয়া গেলে তিনি আমায় বলিলেন, "দ্যাখ্ মা, তোর যত নাড়িভুঁড়ি নিয়ে পৃথিবীর লোকে এর পরে নাচ্‌বে। তোর ঐ ভাণ্ড থেকে এই ছেলে বেরিয়েছে।"

তাঁহাকে আমার বড় ভাল লাগিত। আমি প্রায়ই দক্ষিণেশ্বরে যাইতাম। তিনি কত যে ভাল ভাল কথা বলিতেন তাহা এখন আমার সব মনে নাই।

একবার বলিয়াছিলেন, "দেখ মা, ভায়ে ভায়ে দড়ি ধরে মাপে, আর বলে, এই দিক্‌টা তোর আর ঐ দিক্‌টা আমার। কিন্তু কার যায়গা মাপ্‌ছে আর কেই বা নেয়, সেটা কিছু ঠিক্ করে না।" আর এক-দিন দক্ষিণেশ্বরের বাগানে আমি ও কেশব যাই, তিনি অনেক কথার পর আমায় বলিলেন, "দ্যাখ্ মা, আমি অনেক কষ্টে মাকে ধরেছি, কিন্তু কেশবের সঙ্গে মিশে সেটুকু যায়, বুঝি আমি শেষে এসে নিরাকারে পড়ি।" এই রকম যে কত কথা হইত তার শেষ নাই। কিন্তু এখন সব মনে আসিতেছে না।

লেডি ডফারিণ।

কমলকুটীরে তাঁহার সঙ্গে দেখা হয়, মহারাণী যত ফুলের গহনা আনাইয়া ছিলেন। আমি, তাঁহাকে সমস্ত গহনা এক একটী করিয়া পরাইয়া দিলাম। সমস্ত দেশী খাবার ইত্যাদি খাইলেন। লেডি ডফারিণ যে আমায় কত যত্ন করিলেন তাহা বলা যায় না। তাঁর কথার ভাবে বুঝা গেল, আমাকে দেখে বড় খুসী হইয়াছেন।

আর একদিন তাঁর নিমন্ত্রণ মত মহারাণী সকলকে লইয়া বড়লাট সাহেবের বাড়ীতে গেলেন, আমার সঙ্গে

সরলা ও বুলবুলি * মহারাণীর কথামত গেল। সেখানে লেডি ডফারিণ আমার প্রতি এবং সমস্ত পরিবারের প্রতি কি আদর ও কি যত্ন যে করিলেন, তাহা বলা যায় না। মহারাণীকে যে লেডি ডফারিণ কত ভাল বাসিতেন তাহা তাঁর যত্নে ও আদরে বুঝা গেল।

মাঝে মাঝে বোম্বাই, মাদ্রাজ ও আমেরিকা থেকে অনেক লোক আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিতেন। তার ভিতর সাণ্ডারলেণ্ড, † হারউড্, ধর্ম্মপাল, আরও কে

---

* সরলা কৃষ্ণবিহারী বাবুর প্রথমা কন্যা। তাঁহার দ্বিতীয়া কন্যা (বুলবুলি) প্রমীলা বিখ্যাত সুন্দরী ছিলেন। তাঁহার সহিত প্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার ৺ মনোমোহন ঘোষের পুত্র সিভিলিয়ান মিঃ মোহিনী মোহন ঘোষের বিবাহ হয়। বিবাহের কয়েক বৎসর পরেই স্বামী, মাতা ও ঠাকুরমাতা প্রভৃতি আত্মীয়গণকে শোক-সাগরে ভাসাইয়া পরলোক গমন করেন। এই প্রমীলা সারদাসুন্দরীর সমস্ত উপাসনা, উপদেশ ও মহান্ ভাবময় উক্তি সকল লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। ১৮৯৬ সনের ভয়ানক ভূমিকম্পের সময় সেই সমস্ত খাতা নষ্ট হইয়া যায়। জগতের লোকের নিকট এই সমুদয় অমূল্য ধন চিরকালের জন্য অপ্রকাশিত রহিল। যোঃ।

† রেভারেণ্ড যে, টি, সাণ্ডারলেণ্ড ১৯১৩ ইং জুন মাসের "মডারণ রিভিউ" নামক প্রসিদ্ধ মাসিক ইংরাজি জরনেলের ৬০৮ পৃষ্ঠায় এই দেখার বিষয় অতি ভাবের সহিত উল্লেখ করিয়াছেন। যোঃ।

কে সব ছিলেন মনে নাই। ধর্ম্মপাল এবং আরও ৩।৪ জনসাধুকে আমি নিজে রাঁধিয়া খাওয়াইয়াছিলাম।

আমার এখনকার অবস্থা তুমি জানিতে চাহিতেছ। আমার শ্বশুর দেওয়ান রামকমল সেনের পরিবার শুদ্ধ একত্র করিলে সমুদায় পরিবারে প্রায় ২০০ শতেরও অধিক লোক হইবে। আমার নিজের পরিবারও প্রায় ১০০ শত। এই বৃহৎ পরিবারে প্রতিদিন কোন স্থানে শোক দুঃখ, কোনও স্থানে বা আনন্দোৎসব হইতেছে। এই সমস্ত শোক দুঃখ, আনন্দোৎসবের খবর প্রায় রোজই আমার নিকট আসিতেছে। ভগবান্ আমাকে একেবারে আনন্দে কিম্বা একেবারে দুঃখে থাকিতে দিতেছেন না। সুখে এবং দুঃখে তিনি আমায় পোড়াইতে পোড়াইতে সুখ দুঃখের বাহিরে লইয়া যাইতেছেন। আমার এক অংশ যেমন রাজসিংহাসনের উত্তরাধিকারী, আর এক অংশ গৃহশূন্য, অর্থহীন, প্রায় পথের ভিখারী, সুতরাং সুখ সংবাদেও আমি উতলা হই না এবং দুঃখের সংবাদেও আমাকে কাতর করিতে পারে না। এই সমস্ত লীলাময় হরির খেলা মনে করি, এখন আমি এই প্রকাণ্ড পরিবারের মধ্যে বসিয়া, ভাই, এক চোখে হাসি আর এক চোখে কাঁদি।

উপসংহার।

এই খানেই সারদাসুন্দরীর আত্মকথার শেষ হইল। তারপর তিনি যে কয়েক বৎসর জীবিতা ছিলেন, অধিক দিনের জন্য আমার সঙ্গে তাঁহার কখনো দেখা হয় নাই; সময়ে সময়ে ২।৪ দিনের জন্য দেখা হইত। তাঁহার কথায় ও ভাবে মনে হইত, যেন দেহাবদ্ধ আত্মাটী সুদীর্ঘ কাল নানাপ্রকার অবস্থার মধ্যে আপনার সাধনা দ্বারা পরিপূর্ণতা লাভ করিয়া শেষ দিনের জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। সারদাসুন্দরীর সঙ্গে আমার শেষ দেখা ১৯০৬ ইং ১১ই ডিসেম্বর। তার পরের বৎসরেরই (১৯০৭ ইং) ডিসেম্বর মাসে (২৮এ অগ্রহায়ণ) তিনি পরলোক-গমন করেন। সেই সময়কার যে দুই একখানা চিঠিতে আমি ও আমার স্ত্রী, সারদাদেবীর পরলোক-গমন-সংবাদ পাইয়াছিলাম, নিম্নে তাহা প্রকাশ করিলাম।

Krishna House

২৯এ অগ্রহায়ণ।

নমস্কার দিদি—

তোমাকে পরশু দিন একখানি পত্র দিয়াছিলাম, কিন্তু তাহার জবাব পাইলাম না। কাল

সকাল বেলায় আমাদের প্রিয়তমা ঠাকুর-মা ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। তোমাকে অনেক দেখিতে চাহিয়াছিলেন। অসুখের সময় প্রায় "ধেবড়ী" "ছোটবৌমা", "বেলা", "খগন", ও "সতীশ", বলে ডাকিতেন। নিউমোনিয়া হয়েছিল। বড় কষ্ট পেয়েছেন। * * * তোমাকে আসতে এত লেখ্‌লাম, এলেনা। ঠাকুর-মাকে আর দেখতে পাবে না। নমস্কার লও। ইতি।

তোমার বোঁন্

বেলা।

[সরমা (ধেবড়ী) ও বেলা ৺ কৃষ্ণবিহারী বাবুর সেজ ও ছোট মেয়ে।]

ওঁ

59/3 Bhawani Charan
Dutt's street,
December 29, 1907.

নমস্কার,

যোগীন বাবু, পরম পূজ্যপাদ আরাধ্যা পিতামহী ঠাকুরাণী আমাদের সকলকে এখানে রাখিয়া ভগবদ্ চরণামৃত পান করিতে করিতে সজ্ঞানে ৺বৈকুণ্ঠ ধাম লাভ করিয়াছেন। ৺ লাভের চারি দিবস পূর্ব্বে

তিনি দিদি ঠাকুরাণীকে অনেক দেখিতে চাহিয়া ছিলেন, * * * আপনি যে টাকা পাঠাইয়াছিলেন, দুঃখের বিষয় সে টাকা তাঁর হাতে আসিল না। তাঁর স্বধামে গমনের পর সেই টাকা আসিল।

* * * * *

নরী দাদাও তাঁর ৺লাভের চার দিবস পরে, পরলোক গমন করিয়াছেন। অপনার প্রেরিত টাকা তিনি মৃত্যুর এক দিবস পূর্ব্বে পাইয়া খুব আহ্লাদ করিয়াছিলেন।

মহারাণীর বিশেষ কৃপাতে ৺পিতামহী ঠাকুরাণীর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া অত্যন্ত সমারোহে সম্পন্ন হোল। * * আপনারা সকলেই তাঁহার জিনিষ। মার বিশেষ ইচ্ছা যে আপনারা সকলে তাঁর শ্রাদ্ধের পূর্ব্বে এখানে আসেন। অতএব শ্রাদ্ধের পূর্ব্বে আপনারা অবশ্য এখানে থাকিবেন। আগামী শনিবার অশৌচ যাবে, রবিবার শ্রাদ্ধ। দিদিকে সব বিষয় জানাইবেন। ইতি।

স্নেহার্থী

শ্রীজ্যোতিপ্রকাশ সেন।

[জ্যোতিপ্রকাশ—কৃষ্ণবিহারী বাবুর সেজ পুত্র। নরী দাদা—কৃষ্ণবিহারী বাবুর ভাগিনেয় এবং সারদাসুন্দরীর অতি স্নেহের দৌহিত্র]

সারদাসুন্দরী সম্বন্ধে যে কয়েকখানি চিঠি পাওয়া গিয়াছে তাহা এবং তাঁহার সম্বন্ধে ৺ প্রতাপ বাবু প্রভৃতি যাহা লিখিয়াছেন তাহা এই জীবনীর শেষভাগে দেখুন।

এই আত্মকথা হইতে চিন্তাশীল ব্যক্তি সারদা-সুন্দরীর দেবচরিত্রের কতক আভাস পাইবেন। তাঁহারা স্বীয় চিন্তার দ্বারা এবং প্রতিভাসম্পন্ন লেখনীর দ্বারা ভবিষ্যতে সারদাসুন্দরীর সুন্দর চরিত্র জগৎ সমক্ষে উপস্থিত করেন, ইহাই আমার একান্ত বিনীত প্রার্থনা। ইতি।

শ্রীযোগেন্দ্রলাল খাস্তগীর।

ঢাকা; ১০ই সেপ্টেম্বর ১৯১৩ ইং।

স্বর্গীয়া

সারদাসুন্দরী সম্বন্ধে

কয়েকখানা পত্র ও মতামত।

১। নববিধান-প্রচারক স্বর্গীয় গিরীশচন্দ্র সেন মহাশয় লিখিয়াছেন ঃ—

শ্রীঈসার দেবজীবনের মূলে তাঁহার পরমা সাধ্বী জননী মেরী দেবী বিদ্যমান। ঈশার নামের সঙ্গে মেরীর নাম সংযুক্ত। ক্যাথলিক সম্প্রদায় ঈসার সঙ্গে মেরীর

পূজা করিয়া থাকে। আচার্য্য কেশবচন্দ্রের উন্নত জীবনের মূলে তাঁহার সাধ্বী জননী সারদা দেবী বিদ্যমান। আচার্য্য যখন শেষ জীবনে রোগযন্ত্রণায় অস্থির হইয়া পড়িয়াছিলেন, তখন মা আকুল হইয়া বলিয়াছিলেন, "কেশব, তোমার এই রূপ ক্লেশ কেন হইল? বুঝি আমার পাপে হইয়াছে।" তাহাতে, তিনি বলেন, "মা, তুমি ঐরূপ কথা বলিও না, আমার জীবনে যাহা কিছু ভাল, যাহা কিছু সদ্‌গুণ আমি তোমা হইতে পাইয়াছি।" আচার্য্য আমাদের কাছে বলিয়াছেন, "আমার মা বড় ভাল।" এরূপ জননীই আদর্শ জননী।

পরম ভক্তিভাজন নববিধানাচার্য্য কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের বন্দনীয়া জননী সারদা দেবী যে, প্রায় নব্বই বৎসর বয়সে নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করিয়া বিগত ২৮শে অগ্রহায়ণ দিব্যধামে চলিয়া গিয়াছেন, এই সংবাদ গত অগ্রহায়ণ মাসের মহিলার সংবাদস্তম্ভে প্রকাশ করা গিয়াছে। মা অতিশয় সতী সাধ্বী ভক্তিমতী পরসেবানুরক্তা ছিলেন। তাঁহার বিরুদ্ধে কাহারও কিছু বলিবার নাই। তিনি শত্রু মিত্র সকলকে সমান ভাবে স্নেহ ও আদর করিতেন। ভালবাসা ভিন্ন তিনি জানিতেন না, কাহারও বিরুদ্ধে কখনও কোন কথা বলিতেন না। সকল ধর্ম্মাবলম্বীর প্রতি, সকল সাধু সজ্জনের প্রতি তাঁহার সমান আদর ছিল। তিনি কুলপাবন পুত্র

কেশবচন্দ্রকে যে স্নেহ করিতেন তাহা নয়, দেবতাজ্ঞানে ভক্তি করিতেন। তাঁহার শ্বশুরকুল বৈষ্ণব ধর্ম্মাবলম্বী, তিনি সুপ্রসিদ্ধ রামকমল সেন মহাশয়ের পুত্রবধূ, প্যারীমোহন সেন মহাশয়ের ধর্ম্মপত্নী ছিলেন। দেবী হিন্দুসমাজভুক্ত থাকিয়াও ব্রাহ্মসমাজের উৎসবাদিতে রীতিপূর্ব্বক যোগ দিয়াছেন, আর্য্যনারী সমাজের উৎসবে এবং নব দেবালয়ের উপাসনাতে যোগদান করিয়া প্রার্থনাদি করিয়াছেন, উপাসনা, প্রার্থনা ও সঙ্গীতাদিতে অত্যন্ত আনন্দ ও আগ্রহ সহকারে যোগদান করিতেন। আমরা বহুদিন প্রতিসপ্তাহে তাঁহার অনুরোধে তাঁহার কলুটোলাস্থ গৃহে যাইয়া উপাসনাদি করিয়াছি; তাহাতে তিনি অতিশয় আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন, এবং উপাসনান্তে মিষ্টান্ন ভোজন না করাইয়া আমাদিগকে বিদায় দান করিতেন না। তিনি প্রথম বয়সে ধনী পরিবারের বধূ ছিলেন, সম্পদের ক্রোড়ে সুখে স্বচ্ছন্দে দিন যাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার হৃদয় বৈরাগ্যপ্রধান, অনাসক্ত ছিল। তিনি ২৫ বৎসর বয়ঃক্রম কালে বিধবা হইয়াছিলেন। তাঁহার গর্ভে তিন পুত্র ও চারি কন্যা জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। পুত্রের মধ্যে কেশবচন্দ্র মধ্যম ছিলেন। তিনি জীবদ্দশায় সমুদায় পুত্র কন্যা ও অনেক পৌত্র পৌত্রী দৌহিত্র দৌহিত্রী ও জামাতার বিয়োগ-শোক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মাতা জরাদুর্ব্বল শরীরেও

কিয়দ্দিন পূর্ব্বে স্বয়ং হবিষ্যান্ন রন্ধন করিয়া ভোজন করিয়াছেন, কাহারও সেবার প্রত্যাশা করেন নাই। নিজে সর্ব্বদা বিস্তীর্ণ পরিবারের সেবা করিয়াছেন। মাতৃগুণ পাইয়া কেশবচন্দ্র অত বড় লোক হইয়াছিলেন। মাতা সুপাচিকা ছিলেন, স্বয়ং রন্ধন পরিবেশন করিয়া স্নেহের পাত্র-পাত্রীদিগকে ভোজন করাইতে আগ্রহ প্রকাশ করিতেন, তাহাতে তাঁহার বিশেষ আনন্দ ছিল। যখন অত্যন্ত জরা-দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিলেন তখনও রন্ধন করিয়া আমাদিগকে ভোজন করাইবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন, আমরা তাহা করিতে বারণ করিয়াছি। একদা ইন্দোরের মহারাজা টুকাজী রাও হোলকার কলিকাতায় আসিয়া মার স্বহস্তে প্রস্তুত ব্যঞ্জনাদি খাইতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। মা কয়েক প্রকার ব্যঞ্জন রন্ধন করিয়া তাঁহার নিকটে পাঠাইয়া দেন। তাঁহার স্নেহ-মধুর-প্রকৃতি, ভগবদ্ভক্তি, বৈরাগ্য, নিষ্ঠা, সেবানুরাগ, সকলের হৃদয়ের ভক্তি আকর্ষণ করিয়াছে। তিনি সর্ব্বদাই ইচ্ছা করিতেন, তাঁহার স্নেহাস্পদ প্রচারকগণ সময়ে সময়ে তাঁহার নিকটে যাইয়া ভগবৎ-প্রসঙ্গ, উপাসনাদি করেন, দুঃখের বিষয়, সেই সেবা প্রচারকদিগের দ্বারা অতি অল্পই হইয়াছে। তিনি অনেক সময় বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির নাম করিয়া দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন যে, অমুকে আমাকে একবার দেখি-

তেও আইসে না। ২৮শে অগ্রহায়ণ প্রাতে তিনি স্বর্গগতা হন, পূর্ব্বদিন রাত্রিতে তাঁহার স্নেহের পৌত্র শ্রীমান্ প্রমথলাল তাঁহাকে দেখিতে গিয়াছিলেন। প্রমথ-লালকে দেখিয়াই তিনি—"গান কর, তাঁহার নাম কর" বলিতে থাকেন। অপরাহ্ণ ৩টার সময় সতীর পবিত্র দেহ তাঁহার ব্রাহ্ম ও হিন্দু আত্মীয়গণ সম্মিলিত ভাবে বহন করিয়া শ্মশান-ভূমিতে লইয়া যায়। হিন্দু পৌত্রগণ হিন্দুমতে, ব্রাহ্ম পৌত্র শ্রীমান্ প্রমথলাল সেন নবসংহিতা মতে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পাদন করেন। ১৫ দিবস অন্তে ব্রাহ্ম পৌত্রগণ ব্রাহ্মমতে ও হিন্দু পৌত্রগণ হিন্দু মতে মাতার শ্রাদ্ধ ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়াছেন।

২। শ্রদ্ধাস্পদ স্বর্গীয় সি, সেন * মহাশয় লিখিয়াছেন ঃ—

স্বর্গীয়া সারদা দেবী।

আজ কোথায় নবীন! কোথায় কেশব! কোথায় কৃষ্ণবিহারী! ভক্তিরূপা জননীর শ্রাদ্ধ করিতে তাঁহারা কেহই রহিলেন না। তিন জনেরই এবারকার ব্যক্তিত্ব অনন্তের ক্রোড়ে বিলীন হইয়া গিয়াছে, কিন্তু তাঁহাদের

* সবজজ স্বর্গীয় চণ্ডীচরণ সেন।

স্মৃতি এখনও মিটে নাই, কিছুদিন পরে মিটিবে, তবে, কেশবের স্মৃতি মিটিবার নহে, তাহা কল্পান্ত পর্য্যন্ত কোথাও না কোথাও ফুটিয়া থাকিবে সন্দেহ নাই।

আলেকজাণ্ডার, হানিবল, সিজার, নেপোলিয়ন প্রভৃতি যুদ্ধবিদ্যাবিশারদ অমিত-পরাক্রম ব্যক্তিগণকেই সাধারণ লোকে মহাবীর বলিয়া সম্মান করিয়া থাকে, এবং তাঁহাদের গর্ভধারিণী মহিলাদিগকে বীরপ্রসবিনী নাম প্রদান করত ধন্যবাদ দেয়; কিন্তু ধর্ম্মবীর মহাপুরুষ-দিগের দেহ যাঁহাদের শরীরসম্ভূত, সাধারণ লোকে তাঁহাদিগকে বড় একটা বুঝিতে পারে না। ঐ সকল দেবীগণ যে আমাদের কি পরিমাণে পূজনীয়া তাহা হৃদয়ঙ্গম করা যে সে মানুষের কাজ নয়। পৃথিবীর অন্যান্য ক্ষণজন্মা ধর্ম্মাত্মাগণের জননীদের বিষয়ে আমরা সম্যক্ অবগত নহি; কিন্তু আমাদের দেশে বর্ত্তমান সময়ে দয়ার সাগর বিদ্যাসাগরের ও পুণ্যশ্লোক কেশবচন্দ্রের জননীদ্বয় সম্বন্ধে অনেক কথা জানি। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মাতাকে আমাদের মধ্যে অনেকেই দেখিয়াছেন; তাঁহারা সকলেই একবাক্যে তাঁহার কোমল দয়ার্দ্র-হৃদয়ের কথা প্রকাশ করিয়া থাকেন। তাঁহার পরদুঃখ-কাতরতার যে কত কথা আমরা শুনিয়াছি তাহার সংখ্যা করা কঠিন, এক একটী উদাহরণ যেন এক একটী অমূল্য রত্ন; তাঁহার সমস্ত জীবনটাই যেন পরের দুঃখ দূর করিবার চেষ্টাতেই

অতিবাহিত হইয়াছে। মাতৃ-ভক্ত পুত্রও এ বিষয়ে তাঁহার বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন সন্দেহ নাই। তিনি এক শ্রেণীর মহোচ্চ জীব ছিলেন। আর কেশবজননী যেন অমানুষিক সহিষ্ণুতা ও সেবাপরায়ণতার দৃষ্টান্ত দ্বারা আমাদিগকে উপদেশ দিবার জন্যই আবির্ভূত হইয়াছিলেন। সারদাদেবীর জীবনটা যেন ক্লেশময় এবং সেই সকল ক্লেশ তিনি যেরূপ অসাধারণ ভাবে বহন করিয়া গিয়াছেন তাহা জগতের রমণীমাত্রের আদর্শ হইয়া যাবচ্চন্দ্রদিবাকর বিরাজ করিবে। পুণ্যসলিলা ভাগীরথী যে দিন কেশবের চিতাভস্ম ভাসাইয়া আপনাকে ভাগ্যবতী মনে করিয়াছিলেন, কমল-কুটীরের মধ্যাহ্নসূর্য্য অকালে অস্তমিত হইয়া যে দিন তথায় দিবসে আঁধার দেখা দিয়াছিল, আনন্দময়ী কলিকাতা নগরী যে দিন সহসা নিরানন্দে মুহ্যমান হইয়াছিল, সমগ্র ভারত যে দিন মহাপুরুষের শোকে অভিভূত হইয়াছিল, পাঠক পাঠিকা, ভাবিয়া দেখুন তাঁহার গর্ভধারিণীর পক্ষে সেই নিদারুণ দিবস কিরূপ ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিল, পরন্তু ওরূপ তমসাচ্ছন্ন দুর্দ্দিনেও তিনি ভগবচ্চরণ হইতে বিচলিত হয়েন নাই, পাষাণে হৃদয় বাঁধিয়া বিধাতার মঙ্গলবিধানে বিশ্বাস রাখিয়া ইষ্টনাম জপ করিতে ত্রুটি করেন নাই।

এরূপ দশজন জননী যে জাতির মধ্যে এক সময়ে বর্ত্তমান থাকেন সে জাতি হু হু করিয়া উন্নতির পথে

অগ্রসর হয়। দুঃখের বিষয় আমাদের এই দুঃসময়ে এরূপ আর একজন খুঁজিয়া পাওয়া ভার হইয়াছে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মাতা শচীদেবীর কথা পুস্তকে পড়িয়াছি, আর তদনুরূপ সারদা দেবীকে সশরীরে দেখিয়া আমরা নয়ন মন তৃপ্ত করিয়া চরিতার্থ হইয়াছি।

আমার বিশ্বাস, নববিধান সমাজে যে মহিলা তাঁহার পবিত্র চরিত্রের দ্বারা আমাদিগকে উপদেশ দিয়াছেন ও দিতেছেন তিনিই সারদা দেবীকে আদর্শরূপে সম্মুখে রাখিয়া ভক্তি বিশ্বাস সেবার পথে অগ্রসর হইয়াছেন ও হইতেছেন। "এ ত কথার কথা নয় রে ও ভাই, ভাবের কথা নয়, জীবনে দেখা'তে হ'বে যুগান্ত প্রলয়।" দেবোপমা মাতা সারদাসুন্দরী মানবসমাজের একটী মূল্যবান্ রত্ন। শতরাজার ধন একমাণিক বলিয়া তাঁহাকে চিরকাল পূজা করা কর্ত্তব্য, একথা বলা বাহুল্য। শুধু ব্রাহ্মদের কেন, শুধু হিন্দুদের কেন, এরূপ মহাজীব সকল সম্প্রদায়েরই বন্দনীয়।

C. Sen (মহিলা পত্রিকা)।

৩। নববিধান-প্রচারক ভক্তিভাজন স্বর্গীয় প্রতাপচন্দ্র মজুমদার সারদাসুন্দরী সম্বন্ধে লিখিয়াছেন :—

"She is sixty years old now. But she wears on her benign face the serenity and sunshine of conscious purity and the light of Divine grace. When Kesub finds the recognition of his greatness by a grateful posterity, I hope and trust the claims and virtues of his good, noble-hearted mother will not go unrecognized."

(*The Christian Register*)

Rev. J. T. Sunderland M. A., of Ottowa, Canada in his "Some thoughts concerning Keshab Chandra Sen" (The Modern Review of June, 1913, Page 608) writes :— * * * I never heard or saw Mr. Sen. I was not in England when he made his famous visit there. * * * When Mr. Protap Chandra Mazumdar came to America, as he did three times, * * * * * * one of his lectures was upon Mr. Sen * * * * * and in his articles published in the Christian

Register, he gave extended accounts of his (Keshab's) life, character and work, and of his family. One article I particularly remember upon "Keshab's Mother," in which with rare tenderness he told the touching story of her charming young maidenhood, her marriage, her early widowhood, and her long life of love, self-forgetfulness, piety, beautiful care of her children, uncomplaining toil, and faithfulness in every duty however humble. He called her "Our dear Mother Saroda".

* * * * When I visited India in 1895-96 * * * it was a very great gratification too, to meet the mother and brother of Keshab Chandra Sen, and also his wife and children. I think I may truly say, that no places that I visited in Calcutta touched me quite so deeply as his (Keshab's) birth place, the room where he died and the beautiful chapel or "Sanctuary" which he built close beside his home and the spot where his ashes rest.

৫। ভক্তিভাজন প্রচারক শ্রীযুক্ত কান্তি-চন্দ্র মিত্র লিখিয়াছেন ঃ—

ঝামাপুকুর লেন
১৪ই জুন ১৯১৩ ইং।

প্রিয়তম যোগেন্দ্রলাল। মঙ্গল হউক, আমাদের মা সরলা যে-রূপ পরিশ্রম করিয়া তাঁহার পিতামহীর জীবনী লিখিয়াছেন তাহা পাঠ করিয়া বিশেষ সুখী হইয়াছি। তোমরা যে শীঘ্রই তাহা পুস্তকাকারে ছাপাইয়া প্রকাশ করিবে এ সংবাদে বিশেষ সুখী হইলাম। সরলাকে আমার প্রাণের ভালবাসা দিয়া বলিও, স্বর্গের আশীর্ব্বাদ তাঁহার মস্তকে অজস্রধারে বর্ষিত হইতেছে। আমি শৈশব হইতে মাতৃস্নেহে বঞ্চিত, আচার্য্য-মাতাকে পাইয়া আমার মার অভাব দূর হইয়াছে। এমন স্নেহময়ী মা আর আমি দেখি নাই। এত ভালবাসা-প্রবণ হৃদয় অতি বিরল। পরকে আপনার করিতে তিনি যেমন পারিতেন এমন তো আর কাহাকেও দেখি না। তাঁহার ভালবাসার হেতু ছিল না। কাহার কষ্টের কথা শুনিলে, কাহার মুখ মলিন দেখিলে তাঁহার প্রাণ অস্থির হইয়া পড়িত। আমাদের জন্য যে তিনি কত ভাবিতেন তাহা বলে শেষ করা যায় না। নিজের কষ্ট দুঃখ তিনি ভুলিয়া গিয়া পরদুঃখ মোচন জন্য সর্ব্বদা

ব্যস্ত থাকিতেন। আমার এই জীবনে আমি তাঁহার স্নেহ ভালবাসা যে কত সম্ভোগ করিয়াছি তাহা আর কি বলিব? সত্যই তিনি স্বর্গের দেবী, কেশবের মা হইবেন বলিয়াই ধরায় আসিয়াছিলেন। আজ তিনি স্বর্গধামে পুত্র কন্যা সঙ্গে লইয়া প্রকৃত সুখ শান্তি ভোগ করিতেছেন, এ অধম সন্তান আজও এই পৃথিবীতে রহিয়াছে। প্রাণে খুবই দুঃখ রহিয়া গিয়াছে, মা আমাকে এমন করিয়া ভালবাসিলেন, আদর যত্ন করিলেন আমি এমন মায়ের কিছুই সেবা করিয়া ধন্য হইতে পারিলাম না। তাঁহার ক্ষমা-প্রবণ প্রাণ, নিশ্চয়ই আমাকে ক্ষমা করিয়াছেন। আজ সেই মাতৃ-চরণে প্রণাম করি। যার সরল প্রার্থনার স্বাদ এখনও প্রাণে বাজিতেছে। কবে তাঁহার চরণ তলে যাইয়া বসিব; দয়াময় শ্রীহরি কবে আশা পূর্ণ করিবেন?

অধম কান্তিচন্দ্র মিত্র।

৬। ভক্তিভাজন প্রচারক শ্রীযুক্ত প্যারী-মোহন চৌধুরী লিখিয়াছেন:—

আমি প্রতি সপ্তাহে একদিন নিয়মিতরূপে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের পূজনীয়া জননীর সন্নিধানে সংক্ষেপে ব্রহ্মোপাসনা করিতাম কখন কখনও ব্রহ্মানন্দের সহোদর

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত কৃষ্ণবিহারী সেন মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যাও উপস্থিত থাকিতেন। একদিন আমি নিম্নোক্ত গানটী করি; "হৃদি সরোবর হতে পদ্মপুষ্প তুলিয়ে, মনসুখে গাঁথি মালা প্রাণনাথকে পরাব।" এই গানটী শুনিবার পর পূজনীয়া মাতৃদেবী একটী সুন্দর প্রার্থনা করেন। তাহার মর্ম্ম এই ঃ—"হে ঠাকুর, আমার হৃদি সরোবরে তুমি তিনটী পদ্ম ফুল ফুটাইয়া দিলে; সেই তিনটী পদ্মফুল. নবীন, কেশব, এবং কৃষ্ণবিহারীকে তোমার পাদপদ্মে অর্পণ করিয়াছি।"

হিমালয়ে মৈশুরী পর্ব্বতে যখন তাঁহার জননী এবং কয়েকজন বন্ধুকে লইয়া ব্রহ্মানন্দ বাস করিতেছিলেন তখন আমি উক্ত জননীকে লইয়া হরিদ্বার দর্শন করিতে যাই। সে সময় জননীর স্বর্গীয় স্নেহ-ব্যবহারে আমি অত্যন্ত উপকৃত হইয়াছিলাম।

শ্রীপ্যারীমোহন চৌধুরী।
৩নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট্
13—6—13.

৭। ভক্তিভাজন প্রচারক শ্রীযুক্ত দীননাথ মজুমদার লিখিয়াছেন ঃ—

LAHIRIA SARAI,

The 13th June, 1913.

স্নেহাস্পদেষু।

প্রিয় যোগেন্! কাল ঢাকা হইতে হঠাৎ তোমার পত্র পাইয়া বিস্মিত হইলাম। বাঁকিপুর হইতে তোমাকে কি ঢাকায় বদ্‌লি করিয়াছে? ওখানে কি কাজের ভার দিয়াছে? আশা করি স্নেহের সরলা ও ছেলে পুলে তোমরা সকলে কুশলে আছ। তোমরা আমার স্নেহভালবাসা লইবে।

কেশবজননীর আত্মজীবনী ছাপাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছ শুনিয়া সুখী হইলাম। তোমরা উভয়ে কি ইহার উদ্যোগী? সরলা কি তাঁহার মুখে শুনিয়া লিখিয়াছিলেন?

ধর্ম্মবীর কেশবের প্রসূতির ন্যায় একটি আদর্শ মহিলার বিবিধগুণে অলঙ্কৃত জীবন-কাহিনী যে সমগ্র মহিলাকুলের জীবন গঠনের পথে বিশেষ সহায় হইবে তাহাতে অনুমাত্র সন্দেহ নাই। মহাপুরুষ কেশব নববিধানের প্রবর্ত্তক ও প্রেরিত মণ্ডলীর অগ্রণী বলিয়া

যে প্রেরিত ও প্রচারকগণ তাঁহাকে মাতৃসম্বোধন করিতেন তাহা নহে, কিন্তু বাস্তবিক সকলের প্রতিই তাঁহার প্রকৃত মাতৃস্নেহ প্রকাশিত হইত বলিয়াই আমরা সকলে তাঁহাকে মা বলিয়া ডাকিতাম। আমার ও আমার সহধর্ম্মিণী স্বর্গগতা সাধ্বী মুক্তকেশী দেবীর প্রতি তাঁহার বিশেষ বাৎসল্য ছিল। সন্তানের ন্যায় আমাদের স্নেহ করিতেন। কলুটোলার বাটীতে সাক্ষাৎ করিতে গেলে কত আনন্দ ও উৎসাহের সহিত আমাদের উভয়কে খাবার দিতেন, এমনকি স্বহস্তে পান পর্য্যন্ত আনিয়া দিতেন, সে জন্য সঙ্কুচিত অন্তরে আমরা তাঁহাকে অনুযোগ করিতাম। বলিতেন "সে কি বাবা! তোমরা আমার ছেলে, বউ, তোমাদের হাতে করে দেব না তো কি?"

সম্পদের গৃহে, কলিকাতার একটী গৌরবান্বিত পরিবারের আদরের বধূ ও মর্য্যাদাপন্ন স্বামীর পত্নী হইয়াও তাঁহার ভাব, ভাষা ও আচরণে কখনও অভিমানের আভাসও প্রকাশ পাওয়া দূরে থাক, বড়, ছোট, ধনী নির্ধন, হীন নীচ, ভৃত্য ও দরিদ্র ভিক্ষুকে অবধি বিনীত ও সুমিষ্ট ব্যবহার করিতেন। অতিথি বা নিমন্ত্রিত জনে স্বহস্তে রন্ধন পরিবেশন করিয়া সেবা করিতে ভালবাসিতেন। উচ্চনীচ সকলেই তাঁহার আদর যত্ন স্নেহে পরম আপ্যায়িত হইতেন। লজ্জা, ভয়, সরলতা,

নিষ্ঠা, বিশ্বাস, ভক্তি, দয়া, দাক্ষিণ্য, সেবা প্রভৃতি নানা সদ্‌গুণ বৈরাগ্যের দ্বারা মুকুটিত হইয়া তাঁহার জীবনকে শ্রদ্ধা ভক্তির আলয় করিয়াছিল।

বৈষ্ণব পরিবারের কন্যা গৃহিণী বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া আযৌবন মূর্ত্তি পূজায় অভ্যস্ত থাকিলেও সুযোগ মতে আমাদের সঙ্গে—আপন পুত্র কেশবচন্দ্রের সঙ্গে উপাসনায় যোগ দিয়া বিশেষ আনন্দলাভ করিতেন। প্রথম প্রথম বলিতেন "কেশব, তোমার ধ্যানটী আমাকে শিখিয়ে দেও।" অবকাশমতে আমার সঙ্গে মাঝে মঝে ধর্ম্মপ্রসঙ্গ করিতেন। বলিতেন, "বাবা, ছেলেবেলার অভ্যাসমত নিত্য পূজা করিলেও তোমাদের ধ্যানটী না কল্লে এখন আর আমার পূজা সম্পূর্ণ হয় না।" "কেশবের কল্যাণে কি উপাসনাই শিখিছি" ইত্যাদি অনেক কথা বলিতেন। প্রায়ই ব্রহ্মমন্দিরে যাইতেন, এবং অবকাশ মত যখন "কমলকুটীরে" আসিতেন, দেবালয়ের নিত্য উপাসনায় যোগ দিয়া বিশেষ আনন্দ সম্ভোগ করিতেন। ক্রমে উপাসনার মধ্যে নিজে ব্যক্তিগত প্রার্থনা করিয়া সময়ে সময়ে সমুদায় উপাসক উপাসিকার প্রীতিবর্দ্ধন করিতেন।

হিন্দুনারী স্বভাবত ভীরু, সামান্য সাংসারিক বিপাকে কি করিবে বুঝিতে পারে না। মাতা সারদাসুন্দরী সেরূপ পরীক্ষার মধ্যে বীরপ্রসূতির পরিচয় দিয়া

অকুতোসাহসের সহিত উপস্থিত বিপত্তিকে অতিক্রম করিতে পারিতেন। সে সময় যেন একটী সাহসী পুরুষের মত বিক্রম দেখাইতেন। অশীতি বর্ষের অধিক বয়স হইয়াছিল তথাচ স্বয়ং স্বহস্তে রন্ধন করিয়া নিত্য হবিষ্য করিতেন। ধর্ম্মে যেমন, কর্ম্মে তেমনি, সেবায় সমধিক অনুরাগ ছিল। যৌবনে বিধবা হইয়া কখনও অধীরতার সহিত শোক প্রকাশ করেন নাই। তাঁহার জীবনী বাস্তবিকই জগতের বিশেষ কল্যাণজনক বিশেষতঃ বঙ্গীয়া মহিলাদের বিশেষ মঙ্গলের জন্য হইবে। ভগবান্ তাঁহার উন্নত জীবনকে নারীকুলের মধ্যে বিস্তার করিয়া নববিধানকে আশীর্ব্বাদ করুণ।

শুভাকাঙ্ক্ষী—শ্রীদীননাথ মজুমদার।

৮। ভক্তিভাজন স্বর্গীয় গিরিশচন্দ্র সেন মহাশয়ের আর একখানি পত্র ঃ—

৩নং রমানাথ মজুমদার
ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।
৩১।১২।০৮।

আয়ুষ্মতী
শ্রীমতী সরলা দেবী।

মা,

ভরসাকরি ঈশ্বর প্রসাদে তোমরা কুশলে আছ। অগ্রহায়ণ মাসের মহিলা পাইয়া পড়িয়া থাকিবে।

এখন কি করিবে? আমার মনে হয় ঠাকুরমার জীবনী অসম্পূর্ণ না রাখিয়া পূর্ণ করিয়া ফেলা কর্ত্তব্য। যাহা কিছু তাঁহার মুখের কথা আছে তাহা প্রকাশ করিয়া তাঁহার প্রকৃত চরিত্র, ধর্ম্মানুরাগ, বৈরাগ্য, পরসেবা, দয়া, প্রেম, ক্ষমা ইত্যাদি যে অসাধারণ গুণ ছিল, সে সকল সুন্দর রূপে লিখিয়া উপসংহার করিতে হইবে। লালুকে তাহা লিখিবার ভার দিলে তিনি সুন্দর রূপে তাহা লিখিয়া দিতে পারেন। তাহা না হইলে কেশবজননীর চরিত্র একান্ত অসম্পূর্ণ থাকিবে। তোমরাও যাহা জান, যাহা দেখিয়াছ, লিখিবে। আবশ্যক বোধ করিলে অবশেষে কিঞ্চিৎ আমিও লিখিতে পারি। লালু লিখিলে অনেকটা ভাল হইবে। আমি এক প্রকার আছি।

শুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীগিরিশচন্দ্র সেন।

৯। ভক্তিভাজন প্রচারক—শ্রীযুক্ত দুর্গানাথ রায় লিখিয়াছেন ঃ—

আমি এক দিন মাত্র কিছু কালের জন্য পূজনীয়া সারদাদেবীর সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছিলাম। পুষ্প যেমন সহজেই মনকে শুদ্ধ ও সুকোমল করে, এই আর্য্যমহিলার পবিত্র স্নেহময়ী মুর্ত্তি তেমনি সহজেই মনে

স্বর্গীয় ভক্তির সঞ্চার করে। ইনি মা আনন্দময়ীরই ছায়া রূপে প্রতীয়মান্ হইতেন। ইঁহাকে দর্শন মাত্রই মনে হইল—কি শুদ্ধ দেবী মূর্ত্তি! স্নেহপূর্ণ মধুর বাক্য স্বভাবের মাধুর্য্য প্রকাশ করিতে লাগিল। এমন ভক্তি ও প্রীতিময়ী দেবী মূর্ত্তি আমি আর দেখি নাই।

ঢাকা ৩রা আগষ্ট ১৯১৩ ইং।

শ্রীদুর্গানাথ রায়।

১০। ভক্তিভাজন উপাচার্য্য শ্রীযুক্ত বঙ্গচন্দ্র রায় লিখিয়াছেন ঃ—

ভক্তিভাজন ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের মাতৃদেবীকে আমি অনেকবার দেখিয়াছি এবং তাঁহার সরল ও মধুর প্রার্থনাতে যোগদান করিয়া আশ্চর্য্য রূপে মা আনন্দময়ীর প্রতি তাঁহার গভীর ভক্তির ভাব অনুভব করিয়াছি। তিনি যে তাঁহার প্রাণাধিক ভক্ত পুত্রের সহিত কিরূপ একতা লাভ করিয়াছিলেন তাহাই তাঁহার প্রার্থনায় বিশেষ রূপে পরিলক্ষিত হইত। প্রায় প্রত্যেক মহাজন সম্বন্ধে এইরূপ প্রবাদ আছে যে, যেমন মা তেমনি তাঁর ছেলে। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র এবং তাঁহার মাতৃদেবী সম্বন্ধে তদনুরূপ কিছু বলিতে হইলে ইহাই বলিতে হয় যেমন মা তেমনি ছেলে, যেমন ছেলে তেমনি মা। উভয় যেন মাখাজোখা। মা বস্তুতঃই প্রেম ও শুদ্ধতাতে

গঠিত আত্মা এবং ছেলে শুদ্ধতার তেজে ঘনীভূত প্রীতি-যুক্ত ছিলেন। ভক্তের মা তাঁহার ভক্তিমাখা স্নেহগুণে আমাদের প্রতি সন্তান-বাৎসল্য প্রকাশ করিতেন।

আমার এই ধারণা ছিল যে, কলিকাতার বড় ঘরের মেয়েরা ভাল পাক করিতে পারেন না। কিন্তু মাতৃদেবী সারদাসুন্দরী স্বহস্তে পাক করিয়া যখন খাওয়াইলেন, তখন পূর্ব্ব সংস্কার একেবারে তিরোহিত হইল। দেখিলাম এরূপ চমৎকার রূপে পাক করা সকলের পক্ষে সম্ভব নয়। তাঁহার হস্তের খাদ্য সামগ্রীতেও তাঁহার স্নেহের মধুরতা অনুভূত হইত। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের মুখেও তাঁহার মার সম্বন্ধে নানা কথা শুনিয়া আমার হৃদয়ে যুগপৎ মা ও ছেলে উভয়ের প্রতিই ভক্তি উচ্ছ্বসিত হইত।

অবশেষে ছেলের প্রতি মায়ের যে কি শ্রদ্ধাপূর্ণ ভালবাসা ছিল তাহার উল্লেখ করিতেছি। ব্রহ্মানন্দের দেহত্যাগের মুহূর্ত্তে ভাই দুর্গানাথ যাই গাইলেনঃ—

"ঐ দেখ আনন্দময়ী এলেন ধরাতলে রে,
মায়ের প্রেম-কোলে প্রিয় শিশু কেমন হাসে খেলে রে।"

অমনি ব্রহ্মানন্দের মুখে মধুর হাসি ফুটিয়া উঠিল, এবং শোকাকুলা মাতৃদেবী ক্রন্দন সম্বরণ পূর্ব্বক বলিয়া উঠিলেন "দেখ মহাদেবের মুখে হাসি দেখ।"

শ্রীবঙ্গচন্দ্র রায়

১০ই আগষ্ট ঢাকা, ১৯১৩ ইং

পরিশিষ্ট

(ক)

উইলের নকল এইবারে দিতে পারিলাম না বলিয়া দুঃখিত হইলাম।

শ্রীযোগেন্দ্রলাল খাস্তগীর।

(খ)

THE STRUGGLE AND THE TRIUMPH.

(BY LATE BABU KRISHANABIHARI SEN)

The New Dispensation, January 1884.

THE death of our minister has been quite sudden, yet, not so sudden as one might think. It was during the anniversary season of 1882 that he first felt the hand of the disease that brought upon him his untimely end. In the case of another man diabetes would not have been so soon fatal; but it was otherwise with him when we consider the amount of intellectual

work he had to bear. He was a man all spirit; it was hard to dissociate him from intellectual work. His friends advised him not to think; but as the esteemed medical gentleman who attended upon him said, when appealed to on this point, it was as easy to expect the water in a kettle not to boil as to hope that his patient could give up thinking. The disease, when once upon him, sometimes slowly and steadily, sometimes rapidly and abruptly asserted its empire, and his friends had from the first a presentiment that he should not have to live long. One year passed away in anxiety and hope. He appeared once again at the Town Hall in 1883, and his last message was "Asia's Message to Europe." Those who heard the lecture remarked the effort which he went through in delivering it. There was fire in it; but there was faltering too. The steam of Divine fervour spouted from his lips, but the vessel was weak, and it was evident that greater effort might make it burst at any moment. From that time up to Tuesday last it was a process of intense agony on the part of his relatives and disciples

and a course of sublime preparation on the part of himself. There was anxiety painted on the face—anxiety because he had many things to do and yet very little time to do them all. The deceased had a singular rule to guide him in all the moments of his life. He used to think that he had not more than three years to live, and he wanted always to compress his work within that period. It was this which explained the impulsive hurry of all his movements. Now or never, was his motto. Whatever he conceived was immediately put into shape, and he knew no rest till it was actually carried out. He never waited to think of consequences; whether the work survived or not, he was anxious to give birth to a thought; its care and preservation he left to Providence. This trait was beautifully apparent in the last year of his mortal career. Some of his most beautiful utterances came out then. He had a prevision of his coming end, and he became all the more anxious to speak out in a variety of ways. When he went to Simla his friends parted from him in mingled hope and fear. His residence in the hills be-

gan well. It was the serenest and busiest period of his life; It was the period when he put forth his highest powers, when he attempted his highest flights. His devotion was at its sweetest, and his labours were the severest. He then elaborated his Yoga philosophy, and he there carried out its principles in actual life. That face which showed itself so striking after his death was only a part of the festive dress with which Povidence intended that he should start on his bridal procession to a higher world. At Simla he elaborated his great gift to mankind. He taught them to **see** and **hear** and **feel** the great **God** of his being. Many a prophet had taught the way to solve the burning problem of human suffering. Prophets had died before him, and in their death was the solution of the problem which they had come to solve. In our minister's death we get the solution of the same problem in the most striking manner possible. It explains his life, it explains his mission and it explains itself. How could men get through suffering? By making pain lose the character of pain, by making it

sweet. How could this be done? By actual enjoyment of the sweetest object in the world, by actually seeing and communing with the Divine Mother. Look at the loving *Hari*, he said, and pain will disappear. Illness and suffering become themselves the means of our approach to God. In fact, the greater the illness, the acuter the suffering, the greater is the approach to the Holy Being, the greater the enjoyment and repose, the less is pain—an acute pain and the more welcome it becomes to the sublime devotee. It was his mission to preach God to an unbelieving world. He made Him appear in our life, in our breath, in every drop of blood that courses through our veins, in the food that we eat, in the house that we dwell in, in the money that we spend, in the cloth that we wear, in our daily business, in our real enjoyment, in our sore trials. In nature we see Him; in individual life we feel His sublime guidance. The world is full of Him. The plain eye sees poetry, romance and philosophy everywhere in his presence; the prosaic hand has got the philosopher's stone; it touches everything

with it and lo! everything becomes gold. Enter into that *Yoga*, he said, and the hardest realities of life become comprehensible and enjoyable. Alas! his disciples were too slow to understand him; they were too dull to fathom his meanings. Alas! The gulf became at last too inseparable between him and them. Alas! He departed from Calcutta in broken heart and sorrow. He tried to bring them up to his height; they had not the strength to do so. He adopted every means to make them worthy of him; but he was thwarted, he was persecuted; he could do nothing by mortal means. "Unbelievers, ye believe not in me; be ready for my last message. I will do such a thing as will compel you to come round and accept my present. I will show you how a believer can die!" Oh! the determination was fatal. The disease grew upon him. He was forced to leave Simla; he came back a wreck of his former self. What pains he suffered! What torture indescribable he sustained! Not a stone that would not melt at the sight. Day and night, night and day there was this grappling with death. Every system of treatment was

tried, Allopathic, Homeopathic, Yunani and Kabiraji. Every doctor did his best, but every medicine failed. The pain was indescribable, it admitted of no relief. And in the midst of that unutterable agony. in that chamber of horrors, look at his calm, unperturbed, smiling face. When in the greatest agony, he was immersed in Yoga; the Eternal Mother was before him and he forgot his suffering. And so the dark hour came; by noon on Sunday last, he had virtually ceased to speak. The fits became frequent and at last unbearable. In one sense he may be said to have lost his consciousness. But it was not that. When the pain was upon him, he was alive to nothing else and he lost sensiblility to everything else. When the disease advanced to its last stage, he was in a state of stupor; but all throughout he was in Yoga. So that from an early stage of the last illness, he had ceased to belong to us. The extent of the suffering will be realised from the fact rhat it deprived him of the power of speech and made him dead to the world long before death came. That he was not unconscious

was apparent from the fact that to the last he retained his tremendous will-force. A few hours before his death the doctors tried to give him milk; but he compressed his lips and would on no account take it in. So they came away disappointed, declaring it was a simple psychological problem to them how one who was in that state of stupor and coma, could yet show that immense force of will. Every symptom, indeed, of that disease, of that last life, of that last suffering, will afford matter for thought. Every incident of that mournful chapter will require study and contemplation. When the last moment came, when the struggle was over, when the last breath was taken, the unperturbed countenance ceased to show itself. Behold, the usual smile was in his face again, and he died rejoicing in the accomplishment of his mission. When the last tension was over, when the whole system had returned to repose after its deadly struggle, his nature asserted itself again and his natural smile returned once more and sat upon his lips. Here was the triumph at last! Friends and disciples of the departed hero, do ye not believe now? He has died for you; he has shown how death and

suffering can not only be conquered but actually sweetened, by the enjoyment of the Divine presence. How the stern realities of life become accessories to spiritual perfection; how pain itself ceases to be pain and death becomes the dawn of a higher life; how the world becomes a heaven to the sweet child nursed on the Mother's lap. Yes he has taken away your sufferings—learn only now to understand how and why."*

(গ)

সময়ে পাওয়া গেল না বলিয়া এই স্থানে দিতে পারিলাম না।

শ্রীযোগেন্দ্রলাল খাস্তগীর।

(ঘ)

Sir Alfred Croft K. C. I. E., M. A, on the late Babu Krishna Behari Sen.

[Extract from the convocation speech of the Vice Chancellor, Calcutta University. Minutes for the year 1895-96; pages 301-2]

The past year has not left us free from the vicissitudes which attend all human

institutions; and we have again to deplore the loss of many of our fellows who have been removed from us by the hand of death. * * * * * * * The chief characteristic of Krishna Behari Sen was that he was loved. I do not remember to have witnessed at any time a more spontaneous and genuine an outburst of feeling than was evoked by the news of his death nine months ago. In him I lost a personal friend of many years, for whose unassuming goodness and the rare sincerity of character I had a profound regard. He seemed to breathe a purer and serener air than most. No persecution daunted him; poverty did not disturb him; for of these afflictions too he had his share. He lived his life quietly and harmoniously; striving after the free and equal development of all his faculties, moral, intellectual and spiritual; governed throughout by a high ideal. In his work as a teacher he was inspired by lofty aims. Far beyond the range and scope of examination, which bound the vision of too many teachers, he felt a keen, almost a painful responsibility for the welfare of the young lives committed to his charge, and

for the development of their characters along the lines of uprightness and honour. Every incident of college life supplied him with a text upon which to preach a brief sermon by the way, trying with all his heart to inspire his pupils with his own love of goodness and truth.

Graduates of the Calcutta University,—such of you as have received your degrees this day, and to whom, in accordance with recognised presedent, I should now address a word of counsel and encouragement—to you I would say, study the life and humbly emulate the character of Krishna Behari Sen, a man as great to my mind in some respects as his greater brother. His life affords an object lesson within the reach of all, which all may study, and all who do so will study it with profit.

(ঙ)

Extract from the late Krishna Behari Sen's Diary.

Born 3rd December, 1847.

Was 11th months old when father died on 22nd October, 1848.

Accompany mother to Sagor 1851.

Admitted to the. Hindu Metropolitan College 1853.

Leave Metropolitan College, join Hindu School 1858.

Leave the Hindu School and join Hare School 1859.

Join the Calcutta College 1862.

Was confined at home 6 months for taking part in my brother's movement 1862.

Got the sacred thread in the midst great persecution 1862.

Rejoin Hare School 1862.

Pass the Entrance Examination 1863.

Join the Presidency College, January 1864.

Pass the F. A. Examination 1865.

My marriage, May 5th, 1866.

Found myself suddenly deprived of property 1866.

Pass the B.A. Examination, January, 1868.

Pass the Honour M. A. January, 1869.

Join the Weekly Mirror as Sub-Editor 1870.

Become Sub-Editor, Daily Mirror 1871.

Establish the Calcutta School as a joint concern 1872.

Become Rector, Calcutta School, 1874.

Appointed Principal Maharaja's College Joypur, February, 1875.

সারদাসুন্দরীর আত্মকথায় উল্লিখিত কতকগুলি বিষয় ও ব্যক্তির পরিচয়।

২য় পৃষ্ঠা—"শ্বশুর বাড়ী ও বাপের বাড়ী এ পাড়া ওপাড়া বলিলেই হয়" :—

সারদাসুন্দরীর শ্বশুর দেওয়ান রামকমল সেনের বাড়ীও গৌরিভায়। হুগলি সহরের ঠিক অপর পারে গঙ্গার উপর এখনও সেন পরিবারের অতীত গৌরবের চিহ্ন স্বরূপ রামকমল সেনের রাজপ্রাসাদতুল্য অট্টালিকা, ঠাকুরবাড়ী, নাচখানা, দোলমঞ্চ, নহবতখানা ও বাগান প্রভৃতির ভগ্নাবশেষ মাত্র বিদ্যমান রহিয়াছে। ভগ্ন অট্টালিকার মধ্যে একটী ৺ মুরলীধর সেন উদ্ধার করিয়া রাখিয়াছেন। দেওয়ান ৺ মাধব সেনেরও একটী অট্টালিকা এখনো বিদ্যমান আছে। এই সব স্থান আমি ১৮৮৯ ইং সনে দেখিয়াছিলাম। যোঃ।

৭ম পৃষ্ঠা — "তখন রাস্তার ওধারের বাড়ীতেই আমরা সকলে একত্র ছিলাম" :—

বর্ত্তমান হিন্দুহোষ্টেলের পশ্চিম দিকে সেন পরিবারের যে বৃহৎ অট্টালিকা আছে, উহাই সেই বাড়ী। দেওয়ান রামকমল সেন এই বাড়ী স্বীয় ভ্রাতা এবং ভ্রাতুষ্পুত্রদের দিয়া, তাহারি উত্তর দিকে হেলিডে ষ্ট্রীট ও ভবানীচরণ

ভুত্তের ষ্ট্রীটের মধ্যে (৫৯নং ভবানীচরণ দত্তের ষ্ট্রীট) নুতন অট্টালিকা প্রস্তুত করেন। এই বাড়ীতেই গভর্ণমেণ্ট রামকমল সেন ও কেশবচন্দ্র সেনের স্মৃতি রক্ষার্থে Ancient monument হিসাবে মার্ব্বেল প্রস্তর স্থাপন করিয়াছেন। রামকমল সেনের ভ্রাতুষ্পুত্র দেওয়ান মাধবসেনও স্বীয় ভ্রাতা ঠাকুরচরণ সেন হইতে পৃথক হইয়া পুরাতন বাড়ী পরিত্যাগ করেন। এবং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটে (যেখানে এখন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ-মন্দির ও পল্লী নির্ম্মিত হইয়াছে) প্রকাণ্ড অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়া বাস করেন। এই গৃহে মাধব সেনের পুত্র নববিধান বিশ্বাসী ৺ জয়কৃষ্ণ সেন মহাশয় ও তাঁহার ভ্রাতা ছোট আদালতের জজ মিঃ রাজকৃষ্ণ সেন এবং ৺ জয়কৃষ্ণ সেনের পুত্র অধ্যাপক মোহিতলাল সেন প্রভৃতি বাস করিয়াছিলেন।

শ্রীসরলাসুন্দরী খাস্তগীর।

২০ পৃষ্ঠা—"তারপরই তিনি (প্যারীমোহন সেন) গেলেন" :—

প্যারীমোহন সেন ১৮৪৮ ইং ২২এ অক্টোবর তারিখে পরলোক গমন করেন।

৩০ পৃষ্ঠা— "রথযাত্রার কিছুদিন পূর্ব্বে 'আট্‌কে' বাঁধিলাম" :—

'আট্‌কে বাঁধা' ব্রত গ্রহণ করিতে হইলে কোন্ বিশেষ প্রিয় খাদ্য চিরকালের জন্য ত্যাগ করিতে হয় ও টাকা জমা রাখিয়া চিরকাল ব্রাহ্মণ-ভোজনের বন্দোবস্ত করিতে হয়।

৩২ পৃষ্ঠা—"সেই দিন 'নবরাত্রির' সময় কেহ কেহ বলিতেছিলেন" ঃ—

দুর্গোৎসবের সময় দ্বিতীয়া তিথি হইতে দশমী পর্য্যন্ত সারদাসুন্দরী 'নবরাত্রি' ব্রত করিতেন। এই নয় দিন অন্ন আহার ত্যাগ করিতেন; সুধু এক আধ্‌টুকু ফল গ্রহণ করিতেন। একাদশীর দিন ত নিয়মিত রূপে দিবা রাত্রি একবারেই নিরম্বু উপবাস করিতেন। এগার দিনের পর অন্ন আহার করিতেন। এই সময় তিনি ধ্যান, উপাসনা, অন্যের দ্বারা ভাগবৎ ও অন্যান্য ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ ও সৎপ্রসঙ্গে কাটাইতেন। এই ব্রত তিনি তাঁহার শেষ সময় পর্য্যন্ত পালন করিয়াছিলেন।

৬৪ পৃষ্ঠা—"তিনি (নবীন বাবু) বহুমূত্র রোগে মারা যান" ঃ—

নবীনবাবু ১৮৩৩ ইং ২৫এ সেপ্টেম্বর জন্মগ্রহণ করেন, ও ১৮৮৯ইং ২রা সেপ্টেম্বর পরলোক গমন করেন। ইঁহার ও কৃষ্ণবিহারী সেনের মৃত্যুতে সমসাময়িক কাগজে যে সকল প্রবন্ধ বাহির হইয়া-

ছিল, পাওয়া গেলে তাহা জীবনীর শেষভাগে দেওয়ার ইচ্ছা রহিল। যোঃ।

৬৪ পৃষ্ঠা—(কেশবচন্দ্রের জন্মস্থান) "ঐ নীচের যে ঘরটী তোমায় দেখাইয়া দিয়াছি" ইত্যাদি ঃ—

৫৯।১ ভবানীচরণ দত্তের লেনে, বর্ত্তমান ৺কৃষ্ণবিহারী সেন মহাশয়ের বাড়ীর ফটক হইতে বাহির বাড়ীর নীচের তলার উঠানের উত্তরের বারাণ্ডা দিয়া সোজা পশ্চিম দিকে গিয়া) পারিবারিক সমাধি স্থানের উত্তর পশ্চিম কোণে) একেবারে পশ্চিমের ছোট ঘরটীর উত্তর পূর্ব্ব কোণে কেশবচন্দ্রের জন্ম হয়। সারদাসুন্দরীর চিহ্নিত স্থানটীতে আমি একটী বেদী নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছি। কেশবচন্দ্রের জন্ম—ইং ১৯এ নবেম্বর ১৮৩৮; মৃত্যু—৮ই জানুয়ারী ১৮৮৪ ইং।

৮৮ পৃষ্ঠা—"তাঁর যাওয়ার পর" ঃ—

কৃষ্ণবিহারী সেন ১৮৯৫ইং ২৯এ মে বেলা ১১—১৪ মিনিটের সময় বহুমূত্র ও নিউমোনিয়া রোগে পরলোক গমন করেন।